বিক্রয় ও জনসংযোগ প্রতিনিধি হবেন কীভাবে

ডেল কার্নেগি

সূচিপত্র

আমাদের জাতীয় জীবনে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, আর এই কাজে সবচেয়ে সক্রিয় ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ডেল কার্নেগি। কার্নেগিই বোধহয় আজকের দুনিয়ায় একমাত্র মানুষ যিনি সবচেয়ে বেশি বয়স্কদের লেখার আর বক্তৃতার সমালোচনা করেছেন। রিপ্লের 'অবিশ্বাস্য' নামের কার্টুনে প্রকাশ পেয়েছে কার্নেগী প্রায় দেড়লক্ষ বক্তৃতা সমালোচনা করেছেন। সংখ্যাটা শুনে যদি তেমন ধারণা না জন্মায় তাহলে বলি, এর অর্থ হলো কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর যতদিন কেটেছে তারপর জন্মায় তাহলে একটি করে বক্তৃতা।

ডেল কার্নেগির জীবন সত্যিই বিচিত্র মানুষ কোনো মৌলিক ধারণা পোষণ করলে আর তার আগ্রহ থাকলে কি করা সম্ভব এ জীবন তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

মিসৌরীর এক খামারে, রেললাইন থেকে দশ মাইল দূরে জন্মানোর পর তিনি বারো বছর বয়সের আগে কোন গাড়ি দেখেন নি। অথচ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছনোর পর পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁর পরিচিতি।

এই মানুষটি প্রথম জীবনে প্রায় আধ ডজন বার জনগণের সামনে কথা বলতে গিয়ে ব্যর্থ হন, অথচ তিনিই হন আমার ব্যক্তিগত ম্যানেজার। আমার সাফল্যের অনেকখানিই ডেল কার্নেগির শিক্ষার ফলেই হয়েছে।

তরুণ কার্নেগি শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। গোড়ার তাকে পড়ে থাকতে হয় উত্তর পশ্চিম মিসৌরীর ভাঙাচোরা সেই খামারে। হতাশায় মরীয়া হয়ে কার্নেগিপরিবার মিসৌরীর কাছে। ওয়ারেনসবুর্গের স্টেট টিচার্স কলেজের কাছে আর একটা খামার কেনেন।

ওই কলেজে প্রায় ছ'শ ছাত্র ছিলো। কার্নেগির এমন টাকা ছিলো না যাতে শহরে থাকা সম্ভব। তিনি দেখলেন কলেজে সেই ছাত্রদেরই রমরমা, যারা ফুটবল আর বেসবল খেলে বা যারা বিতর্ক আর লোকজনের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বিজয়ী হয়।

খেলাধুলোয় কোন দক্ষতা নেই বুঝেই কার্নেগি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় জয়ী হবেন ভাবলেন। মাসের পর মাস তিনি বক্তৃতা তৈরি করে চললেন।

কিন্তু এতো প্রাণপণ চেষ্টা, হারের পর হারের ফলে বৃথাই গেল। তারপর আচমকা তিনি জয়ী হতে আরম্ভ করলেন। কলেজের সব প্রতিযোগিতাতেই তার জয় হল। অন্য সব ছাত্ররাও এরপর তাকে শিক্ষা দিতে অনুরোধ জানাতে আরম্ভ করল আর তারাও জয়ী হল।

গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর পশ্চিম নেব্রাসকা আর পূর্ব উইওমিঙে তিনি ডাকযোগে শিক্ষার পাঠক্রম বিক্রি শুরু করেন। প্রচুর পরিশ্রম করেও তেমন সাফল্য এলোনা। জীবন ধারণের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে নানা জীবিকা গ্রহণ করতে হল কার্নেগীকে। বিক্রয় প্রতিনিধি হয়ে প্যাকার্ড কোম্পানির ট্রাক বিক্রি তার মধ্যে অন্যতম।

সেই সময় কার্নেগির মতো অসুখী মানুষ বোধহয় আর ছিল না। প্রতিদিনের জীবন তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের আকাঙক্ষা ছিল বই লিখবেন, যে বই লেখার স্বপ্ন তিনি কলেজে পড়ার দিনগুলোয় দেখতেন। শেষপর্যন্ত তাই তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। মনে মনে কার্নেগি ঠিক করলেন গল্প, উপন্যাস লিখতে সুরু করবেন আর রাতের স্কুলে শিক্ষাদান করে জীবিকা নির্বাহ করবেন।

কিন্তু কী শিক্ষা দেবেন? কলেজ জীবনের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে কার্নেগীর মনের পটে জেগে উঠলো বক্তৃতা দেবার শিক্ষাই তাঁকে একমাত্র আত্মবিশ্বাস দিতে পেরেছিলো। এরই মধ্যে তিনি লাভ করেছিলেন সাহস, গতিশীলতা আর ব্যবসা জগতের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষমতা। এই কথা স্মরণ করেই কার্নেগি নিউ ইয়র্কের সমস্ত ওয়াই.এম.সি. এ. স্কুলে বাণিজ্য জগতে মানুষের বক্তৃতাদান শেখানোর ক্লাসে শিক্ষকের কাজের জন্য আবেদন জানালেন।

ব্যাপার কী? ব্যবসায়ীদের বক্তা হিসেবে গড়ে তোলা? অসম্ভব! এটা তারা ভালোই জানেন যে এরকম হতে পারে না। আগে এ চেষ্টা চালিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষ যখন তাকে প্রতিরাতে মাত্র দু ডলার মাইনেও দিতে রাজি হলেন না, কার্নেগি তখন মোট লাভের উপর কমিশনে কাজ নিতে রাজি হলেন–অবশ্য লাভ আদৌ হলে। আশ্চর্য ঘটনা হল, মাত্র তিনবছরে কর্তৃপক্ষ তাকে প্রতিরাতে দু ডলারের বদলে তিন ডরার দিতে থাকেন।

পাঠক্রম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ক্রমে অন্য শহরের স্কুলও এ কাহিনী শুনল। ডেল কার্নেগি নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, লন্ডন, প্যারী–সর্বত্রই খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। যারা তাঁর পাঠক্রমের প্রতি আগ্রহী ছিলেন তাঁদের জন্য ভালো কোন পাঠ্য পুস্তক ছিল না। কিন্তু তাতে উদ্যম হারান নি কার্নেগী–তিনি নিজেই একখানা বই লিখে ফেললেন 'জনগণের সামনে বক্তৃতা ও বাণিজ্য জগতে প্রভাব বিস্তার।' আজ সেই বই সমস্ত ওয়াই এম. সি. এ., আমেরিকান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল ক্রেডিট মেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের সরকারী পাঠ্যপুস্তক।

আজ ডেল কার্নেগীর পাঠক্রমের ছাত্র সংখ্যা অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা পাঠক্রমের ছাত্র সংখ্যার চেয়ে বেশি।

ডেল কার্নেগির দাবি যে কোন মানুষই ক্ষেপে গেলে কথা বলতে পারে। তার মত হল আপনি যদি শহরের সবচেয়ে অজ্ঞ লোককেও মুখে ঘুসি মারেন, সে উঠে দাঁড়িয়ে উন্মত্তের মতই চিৎকার করে মনোভাব প্রকাশ করবে। তিনি আরো বলেন, যে-কোনো মানুষই আত্মবিশ্বাস থাকলে জনগণের সামনে সংলাপে সক্ষম। শুধু তার মনের অভ্যন্তরে আকাঙক্ষা যদি টগবগ থাকে।

আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার পথ তার মতে হল, যে কাজে আপনার ভীতি আছে সেই কাজই করা। এই জন্যই তিনি তাঁর পাঠক্রমের ক্লাসে প্রত্যেককে অল্পবিস্তর বক্তৃতা দিতে বলে থাকেন। শ্রোতারাও সহানুভূতিশীল-কারণ তাঁরা সবাই একই নৌকার যাত্রী। একমাত্র ধারাবাহিক অনুশীলনই সাহস, আত্মবিশ্বাস আর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে।

ডেল কার্নেগী আপনাদের বলবেন যে তিনি আজ পর্যন্ত এই বক্তৃতা দান শিক্ষা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেছেন। কিন্তু তিনি অন্য একটা দাবীও করবেন, আর তাহল তার প্রধানতম কাজ মানুষের ভয় দূর করে সাহস জাগিয়ে তোলা।

কার্নেগীর সব ছাত্রই হলেন ব্যবসা জগতের মানুষ। এই জন্যই তারা চাইতেন দ্রুত কোন ফলাফল। যাতে তাদের শিক্ষাকে তারা কাজে লাগতে পারেন। কার্নেগি সে কাজে যে সম্পূর্ণ সফল আজ তাঁর পাঠক্রমের অভাবিত জনপ্রিয়তাই সেকথা প্রমাণ করে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের সুপ্ত মানসিক ক্ষমতার মাত্র শতকরা দশভাগই জাগিয়ে তোলা সম্ভব। ডেল কার্নেগি বয়স্কদের সুপ্ত ক্ষমতা জাগিয়ে তুলে অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

লাওয়েল টমাস

.

১. মূল দক্ষতা অর্জনের পথ

যে বছর টাইটানিক জাহাজটি উত্তর আতলান্তিকের শীতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় সেই ১৯১২ সালে আমি জনগণের সামনে কথা বলার ক্লাসে শিক্ষাদান শুরু করি। তারপর থেকে হাজার হাজার মানুষ এই ক্লাসে শিক্ষালাভ করেছেন।

প্রথম ধাপ শুরু করার আগে আগ্রহীদের প্রথমেই সুযোগ দেওয়া হয়–এই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে তারা কি লাভ করার আশা করেন সেটা জানাতে। স্বাভাবিক ভাবেই এর উত্তর পাওয়া গেল বিভিন্ন রকম। তবে আশ্চর্যের কথা মূল চাহিদা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এক! আমাকে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে বলা হলেই আমি অত্যন্ত আত্ম-সচেতন আর ভীত হয়ে পড়ি যে ভালো করে ভাবতে পারি না, কি বলবো তা ভুলে যাই। আমি তাই আত্মবিশ্বাস, স্থৈর্য আর চিন্তা-শক্তি চাই। আমি ব্যবসাজগত বা সামাজিক জগতের সামনে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার আর বিশ্বাযযাগ্যভাবে কথা বলতে চাই।'

কথাটা পরিচিত লাগছে নাকি? এর অভাববোধ আপনাকেও বিব্রত করেনি কি? বাইরের জগতের সামনে আপনিও কি চান না বিশ্বাসযোগ্য আর প্রত্যয় উৎপাদনকারী বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে? আমার ধারণা, অবশ্যই তা চান। এ বইটা যে পড়তে আগ্রহ বোধ করছেন তাতেই বোঝা যায় আপনি ভালোভাবে কথা বলার শক্তি অর্জনে আগ্রহী।

আমি জানি এর উত্তরে আপনি কি বলবেন : 'কিন্তু মিঃ কার্নেগী, আপনি কি সত্যিই ভাবেন একদল লোকের সামনে আমি বেশ ঝরঝর করে কথা বলে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করব?'

সারা জীবন ধরেই আমি মানুষকে তাদের ভয় দূর করে সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছি। আমার ক্লাসে যেসব অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে সে কথা লিখলে কয়েকখানা বইই হয়ে যাবে। তাই এটা কোন ভাবার ব্যাপার নয়। আমি জানি একাজ আপনি পারবেন শুধু এই বইয়ে যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে সেগুলো যদি ঠিকমত অভ্যাস করেন।

আপনি যেমন ভাবে বসে থাকতে পারেন তেমন ভাবেই শ্রোতাদের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে কেন চিন্তা করতে পারবেন না? শ্রোতাদের সামনে কথা বলতে গেলে ভয় আপনাকে ঘিরে ধরার কোন কারণ থাকতেই পারে না। মনে রাখবেন, এ অবস্থাকে অনায়াসেই বদল করা সম্ভব, শুধু চাই অভ্যাস আর শিক্ষা পদ্ধতি, এর সাহায্যেই এই ভয় দূর করে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা সম্ভব।

এই বইটি আপনাকে সেই উদ্দেশ্য সফল করতেই সাহায্য করবে। এটা সাধারণ পাঠ্য বই নয়। এতে বক্তৃতা দেওয়ার খুঁটিনাটি বিষয় নেই। এতে নেই কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল এতে রয়েছে সারা জীবন ধরে বয়স্কদের বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষার অভিজ্ঞতার নির্যাস। যেমন আপনি যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকেই আপনি যা হতে চান সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি এ বই। আপনাকে করতে হবে শুধু সহযোগিতা-এ

বইয়ের প্রতিটি নির্দেশ মেনে আপনার কথা বলার সুযোগ এলেই তা কাজে লাগাতে হবে।

এ বই কাজে লাগাতে আপনাকে পরবর্তী চারটি নির্দেশ প্রচুর সাহায্য করবে। ১। অপরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করুন।

জন্মগত ক্ষমতালব্ধ বক্তার মতো প্রাণী আর নেই। সেকালে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারকে যখন উন্নত শিল্প বলে ভাবা হত তখন এমন বক্তা হওয়া নেহাতই কঠিন ছিল। আজকের দিনে বক্তৃতাকে কথপোকথনের বাড়তি সংযোজন বলেই ভাবা হয়। অতীতের সেই মনোহারিণী ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর আজ হারিয়ে গেছে। আজকের যুগে আমরা নৈশভোজে, সভায়, গির্জায়, টি ভি বা রেডিওতে শুনতে চাই শুধু সোজাসুজি বক্তৃতা। এখন আমরা চাই বক্তারা আমাদের একাত্ম হবেন, আমাদের দিকে কথা ছুঁড়ে দেবেন না।

অনেক স্কুলে পাঠ্য বইয়ে বলা হয় জনগণের সামনে বক্তৃতার ব্যাপারটা একটা বন্ধ শিল্প, যা শুধু বহুঁকাল চেষ্টায় কণ্ঠস্বর ঠিক করে ভাষায় অলঙ্কার জুড়েই করা যায়। আমি দীর্ঘকাল, প্রায় সারা জীবনই মানুষকে বুঝিয়েছি জনগণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার কাজ খুবই সহজ। শুধু কতকগুলো সহজ নিয়ম মেনে চললেই হল। ১৯১২ সালে যখন প্রথম এই শিক্ষাদান শুরু করি তখন প্রাথমিক ছাত্রের মত আমিও এর অর্থ জানতাম না। আমি প্রথমে যে শিক্ষাদান শুরু করি তা আমার কলেজী শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

পরে দেখলাম ভুল পথে চলেছি। বয়স্কদের যে ভাবে শিক্ষা দিচ্ছিলাম তারা যেন নতুন কলেজ ছাত্র। আমি দেখলাম, আমি যে ওয়েবস্টার, বার্ড, পিট আর ওডোনেলকে নকল

করতে বলেছি সেটা একেবারেই ভুল। আমার ক্লাসের ছাত্ররা যা চাইছিল তা হল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সাহসের সঙ্গে পরিষ্কার গলায় ব্যবসা জগতের সভায় বক্তব্য রাখা। এরপর সব বই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে কতকগুলো সহজ বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মুখোমুখি হতে আমার দেরী হয় নি। এতেই কাজ হল আর ছাত্ররাও বেশি সংখ্যায় আসতে লাগল।

আমার অফিসের তাকে আর দুনিয়াময় শাখা অফিসে যে সব প্রশংসাপত্র জমিয়ে রাখা আছে সেগুলো যদি দেখতেন, আপনারা অবাক হয়ে যেতেন। এসব চিঠি এসেছে নামী সব শিল্প অধিকর্তার কাছ থেকে যাঁদের নাম সংবাদপত্রের শিরোণাম। এ ছাড়া এসেছে রাজ্যের গভর্ণর, পার্লামেন্টের সদস্য, কলেজের প্রেসিডেন্ট আর শিল্পী জগতের মানুষের কাছ থেকেও। শুধু এই নয়, আরও চিঠি পেয়েছি গৃহকর্ত্রী, মন্ত্রী, শিক্ষক, কোম্পানী অধিকর্তা। শ্রমিক-দক্ষ ও অদক্ষ, ইউনিয়ন সদস্য। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী মহিলা। এঁরা সকলেই চেয়েছেন জনগণের সামনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে গ্রহণীয় হতে। তারা সফলতা লাভ করায় কৃতজ্ঞতায় আমাকে সপ্রশংসা চিঠি না লিখে পারেন নি।

যে-সব হাজার হাজার মানুষকে আমি শিক্ষা দিয়েছি তার মধ্যে একজনের কথাই আমার মনে আসছে যেহেতু ব্যাপারটা সে সময় আমার উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। কয়েক বছর আগে ফিলাডেলফিয়ার একজন সফল ব্যবসায়ী ডি. ডব্লিউ. ঘেন্ট আমার পাঠক্রমে যোগ দেওয়ার পর আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি আমায় বলেন : বহু সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ আমি এড়িয়ে গিয়েছি মিঃ কার্নেগী। বর্তমানে আমি এক কলেজে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। সভায় তাই সভাপতিত্ব করতেই হবে। আপনি কি মনে করেন এই বয়সে বক্তৃতা শেখা সম্ভব?

আমি ওই বয়সের মানুষকে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থেকে জানালাম এটা নিশ্চয়ই সম্ভব আর তিনি সফল হবেনই।

তিন বছর পর তাঁর সঙ্গে আবার মঞ্চে যাই। প্রথম সাক্ষাতের সময় যে টেবিলে বসেছিলাম সেটাতেই আমরা বসি। আমি তার কাছে জানতে চাই আমার ভবিষ্যত বাণী ঠিক হয়েছে কি না। তিনি হেসে একটা নোট বই বের করে দেখালেন কতগুলো জায়গায় তিনি বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তিনি আরও বললেন, এই বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা, বক্তৃতা দান করে যে আনন্দ আমি পাই তার তুলনা নেই।

শুধু এই নয়–তিনি তুরুপের যে তাসটি এবার দেখালেন তা হল ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সভায় প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।

আর একটা উদাহরণ দিই। বি এফ, গুডরিচ কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান এম গুডরিচ একদিন আমার অফিসে এসে বলেন, আমি সারা জীবনে যতবার বক্তৃতা দিতে চেয়েছি ততবারই ভয়ে কেঁপেছি। বরাবর বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেছি আর বসে বসে কথা বলেছি। কিন্তু যখনই দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছে ভয়ে কেঁপে উঠেছি। মুখ দিয়ে যেন কথাই বেরোতে চায়নি। আমার বিশ্বাস হয় না কিছু করতে পারবেন এ ব্যাপারে। আমার সমস্যা বড়ই জটিল।

‘কিন্তু’, আমি বললাম, ‘আমি কিছু করতে পারবো না বুঝলেও এসেছেন কেন?’

‘শুধু একটা কারণে’, তিনি জবাব দিলেন। আমার একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে। লোকটা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। আমার চেম্বার পার হয়ে যাওয়ার সময় সে মেঝের দিকে

তাকিয়ে থাকত, কদাচিৎ মুখ তুলতো। আচমকা দেখলাম সে আমার ঘরে সোজা চিবুক উঁচু করে ঢুকছে আর আমাকে উজ্জ্বল মুখে বলল, 'সুপ্রভাত, মিঃ গুডরিচ!' ওর পরিবর্তনে দারুণ অবাক হয়ে যাই। তাই একদিন বললাম 'কে তোমাকে বদলালে?' সে তখন আপনার সব কথা জানাল। ওর ওই পরিবর্তন দেখেই আপনার কাছে এসেছি।

আমি মিঃ গুডরিচকে বললাম যে তিনি যদি আমার ক্লাসে যোগ দিয়ে যা করতে বলা হবে তাই করলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে আনন্দ পাবেন। তা যদি পারেন তিনি জবাব দেন, তাহলে পৃথিবীতে আমিই হব সবচেয়ে সুখী মানুষ। তিনি আমার ক্লাসে যোগ দিলেন আর অদ্ভুত রকম উন্নতি করলেন। তিন মাস পরে আমি তাকে এক হলঘরে তিনি হাজার মানুষের সামনে মিনিট দুই বক্তৃতা করতে আহ্বান করি। তিনি কথা বলেন প্রায় এগারো মিনিট।

আমার ক্লাসে যারা শিখতে এসেছেন তাঁদের অনেকেরই এ রকম অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে। তাঁদের অনেকেরই এই শিক্ষার ফলে পদোন্নতি ঘটেছে। ব্যবসায় তাদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। এ রকম বহু ক্ষেত্রেই হয় যে ঠিক একটা বক্তৃতাতেই এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছে। এরপর আপনাদের মারিও লাজোর কাহিনী শোনাচ্ছি।

বেশ ক'বছর আগে কিউবা থেকে একটা তার পেয়ে বেশ অবাক হয়ে যাই। সেটা এই রকম : আপনার জবাব না পেলে আমি নিউইয়র্কে এসে একটা বক্তৃতার জন্য শিক্ষা নেব।' সই ছিল : মারিও লাজো'। লোকটির নামও আমার শোনা ছিল না।

মিঃ লাজো নিউইয়র্কে এসে বললেন : 'হাভানা ক্লাব একটা অনুষ্ঠানে তাদের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি পালন করবে আর আমাকেই প্রধান বক্তা করা হয়েছে। আমি একজন অ্যাটনী, জীবনে জনগণের সামনে বক্তৃতা করিনি। যদি তাই ব্যর্থ হই তাহলে স্ত্রী দুঃখ পাবে আর সমাজেও ছোট হয়ে যাব। তাই কিউবা থেকে ছুটে এলাম, যদি কোন কিছু করতে পারেন। মাত্র তিন সপ্তাহ সময় আছে।

ওই তিন সপ্তাহে মারিও লাজোকে নানা ক্লাসে প্রতি রাতে তিন চারবার বক্তৃতা দেওয়ালাম। তিন সপ্তাহ পরে তিনি সেই বক্তৃতাও দিলেন। তাঁর বক্তৃতা এতই ভাল হল যে টাইম পত্রিকায় তাঁকে বিরাট প্রশংসা করা হয়।

ঘটনাটাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে? ঠিকই তাই, বিংশ শতাব্দীতে ভয় জয় করার এক অলৌকিক ঘটনা।

২। নিজের উদ্দেশ্য সামনে রাখুন।

মিঃ ঘেন্ট যখন নতুন দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মনের সুখে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন যা করেছিলেন সেটাই মনে হয় তার সাফল্যের কারণ। তবে এটা ঠিক, তিনি আমার নির্দেশ মেনে চলেছিলেন। আমার ধারণা তিনি তা করেন একজন বক্তা হবেন বলেই। তিনি ভবিষ্যতকে সামনে রেখে কাজ করে গেছেন। আপনাকেও সেইভাবে ভবিষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়িত করতে হবে।

আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সন্দুরভাবে কথা বলবার ক্ষমতা যা সহজবোধ্য হয়ে উঠবে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এটা হলে সমাজে, বন্ধু মহলে আপনার প্রতিপত্তি

কতটা বাড়বে, ব্যবসায়ে এটা কতখানি কাজে লাগাতে পারবেন সেকথাই আপনাকে ভাবতে হবে। সংক্ষেপে এটাই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে।

বক্তৃতা ও ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি' নামে এক প্রবন্ধে ন্যাশনাল ক্যাস বেজিস্টার কোম্পানীর চেয়ারম্যান আর ইউনেস্কোর চেয়ারম্যান এস. সি. অ্যালিন লিখেছেন, 'আমাদের ব্যবসার ইতিহাসে অনেকেই মঞ্চে উঠে চমৎকার কাজ করেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে কানসাসের এক তরুণ আমাদের শাখা অফিসে বিচিত্রি এক ভাষণ দেয়। আজ সেই আমাদের বিক্রয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। আমি জানি আজ তিনি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট।'

আপনার ভাষণের ক্ষমতা আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে আপনার ধারণা করার শক্তি নেই। আমাদের একজন স্নাতক, মার্জো কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হেনরী ব্ল্যাকস্টোন বলেন কার্যকর ভাবে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ আর তাদের সহযোগিতা লাভকেই শিখরে ওঠার সিঁড়ি বলেই আমরা মনে করি।

একবার ভাবুন আপনার শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আনন্দ কতখানি। আমি সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে দেখেছি শ্রোতাদের বক্তৃতা দান করে মুগ্ধ করে রাখার চেয়ে বড় সুখ আর কিছুতেই নেই। এর মধ্য দিয়ে আপনি লাভ করেন একটা ক্ষমতার অনুভূতি।

এবার কোন সভায় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন ভেবে নিন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন মঞ্চের দিকে, চারদিকে নিস্তব্ধ। শ্রোতাদের আপনার কথায় মুগ্ধ করে তুলেছেন, তারপর বক্তৃতা শেষ হতেই শুধু করতালি আর প্রশংসা বাণীর শব্দ। মনে রাখবেন এর একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে।

হার্ভার্ডের বিখ্যাত মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স যে ক'টি কথা লিখে গেছেন তা আপনার জীবনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কথাগুলো আপনার মনে আলিবাবার মত সাহসের দরজাই খুলে ধরতে পারে। কথা কটি এই : 'যে-কোনো বিষয়ই হোক তার প্রতি আপনার আকাঙক্ষা আপনাকে রক্ষা করতে পারে। যদি কোন ফল লাভ আশা করেন নিশ্চিত তা পাবেন। যদি ভাল হতে চান-তাই হবেন। যদি শিক্ষিত হতে চান শিক্ষিতই হবেন। একাগ্র হয়ে এগুলো চাইলেই তা লাভ করতে পারেন। সঙ্গে শুধু একশরকম অনাকাঙিক্ষত জিনিস চাইবেন না।'

ছোট ছোট দলের সামনে ভাষণ দেওয়া শেখা জনগণের সামনে সাধারণ বক্তৃতার চেয়ে অন্যান্য সুযোগ এনে দেয়। আসলে সারা জীবনে আপনি চিরাচরিত কোন জনগণের সামনে বক্তৃতা না করে থাকলেও এই শিক্ষা থেকে যা পাবেন তার মূল্য অনেক। একটি হলো, এই ভাষণ শিক্ষা আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। আপনি যেই বুঝতে পারবেন যে আপনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে একদল মানুষের সামনে বক্তৃতা দিতে পারেন, এটা অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায় ঢের বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একজনের সঙ্গে কথা বলবেন। আমার ছাত্ররা যখন দেখেন তাঁরা ক্লাসের সহপাঠিদের সামনে বক্তৃতা দিতে সক্ষম আর তাতে ছাদ ভেঙে পড়ে না। এর ফলে তারা তাদের বন্ধু বান্ধব, পরিবার, ব্যবসায়িক সহযোগী, ক্রেতা সকলকেই উজ্জীবিত করতে পারেন।

এই ধরনের শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের যে পরিবর্তন হয় সেটা সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে না। অল্প কিছুদিন আগে আমি আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, সার্জন ড. ডেভিড অলম্যানকে প্রশ্ন করি, মানসিক আর শারীরিক দিক থেকে জনসংযোগের শিক্ষার উপকারিতা কী? তিনি হেসে জবাবে বলেন যে তিনি এজন্য একটা প্রেসক্রিপশন

লিখে দেবেন। এটা কোন ওষুধের দোকান তৈরি করতে পারবে না, এটা তৈরি করতে হবে সেই ব্যক্তিকেই, তিনি যদি পারবেন না ভাবেন তাহলে ভুল করবেন।

প্রেসক্রিপশানটা আমার ডেস্কেই আছে। যতবারই তা পড়ি ততবারই মুগ্ধ হই। সেটা এই রকম :

আপ্রাণ চেষ্টায় এমন শক্তি গড়ে তুলুন যাতে অন্যে আপনার মন আর হৃদয় অনুকরণ করতে পারে। আপনার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য সহজে ব্যক্তিকে, দলকে এবং জনগণের সামনে প্রকাশ করতে শিখুন। দেখবেন যে আপনার চেষ্টা যতই এগোতে থাকবে ততই আপনার সত্তা আগের চেয়ে ঢের বেশি করে অপরের উপর প্রভাব ফেলতে পারছে।

এই ব্যবস্থাপত্র থেকে আপনি দ্বিগুণ লাভ করতে পারবেন। যতই অন্যের সামনে বক্তব্য রাখতে পারবেন ততই আপনার আত্মবিশ্বাস বেড়ে উঠে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে। এর অর্থ আপনি আবেগ মণ্ডিত করেছেন, আর তাতেই শারীরিকভাবেও আপনার উন্নতি হবে। বর্তমান জগতে এই জনসংযোগ আর বক্তৃতা তরুণ বা বয়স্ক সকলেরই দরকার। ব্যবসার দুনিয়ায় এর কার্যকারিতার কথা আমি জানি না। তবে স্বাস্থ্যের দিকে অফুরন্ত। একজনই হোক বা অনেকেই হোক পারলেই তাদের সামনে বক্তব্য রাখুন দেখবেন আপনার মধ্যে পরিবর্তন আনবেই।

এধরনের ধারণা থাকা চমৎকার। কোন ওষুধের বড়িতে তা পাবেন না।

৩। সাফল্যের জন্য মনকে তৈরী করুন।

একবার এক বেতার অনুষ্ঠানে আমাকে তিনটে কথায় বলতে বলা হয় জীবনে কোন্ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছি। আমি বলেছিলাম : সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তা হল আমরা যা ভাবি তার অসামান্য গুরুত্ব। আপনি কি ভাবেন যদি জানতে পারতাম তাহলে বুঝতে পারতাম আপনি কি, কারণ আপনার চিন্তাই জানিয়ে দেয় আপনি কি। আপনার চিন্তাধারা বদল করে আমরা আপনার জীবনই বদলে দিতে পারি।'

এখন আপনি চাইছেন আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কার্যকর জনসংযোগ গড়ে তোলা। অতএব এখন থেকে আপনার কাজ হল নঙর্থক ভাবনা ছেড়ে চেষ্টায় সফল হওয়ার কার্যকর চিন্তা করা। আপনাকে অবশ্যই লোকের সামনে কথা বলার একটা আশাবাদী মন গড়ে তুলতে হবে।

একটা কাহিনী শোনাব এবার। দেখতে পাবেন একাগ্রতা থাকলে যে কেউ কিভাবে বক্তৃতা করার চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। যার কথা বলছি তিনি অনেক নিচু থেকে উঠে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রায় ব্যবসা জগতের প্রবাদে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু প্রথম জীবনে কলেজে যখন তিনি বক্তৃতা দিতে উঠতেন তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোত না। মুখ সাদা হয়ে যেত তাঁর, পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলতে না পেরে তাঁকে মঞ্চ থেকে সজল চোখে পালাতে হত।

অল্প বয়সে যার এ অবস্থা ছিল, ব্যর্থতা তাঁকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তিনি শপথ নেন একজন ভালো বক্তা হবেন। আর তাতেই না থেকে তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্ব-প্রসিদ্ধ সরকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তার নাম ক্লারেন্স বি. র‍্যাণ্ডেল। তাঁর একটা বই 'ফ্রিডম'স ফেথ'-এ তিনি জনসংযোগ সম্পর্কে বলেছেন সব রকম কাজেই আমার অভিজ্ঞতা

জমেছে। আমি হাজির হয়েছি ব্যবসায়িক সভায়, চেম্বার অব কমার্সেও, রোটারী ক্লাবে এই রকম বহু জায়গায়। মিশিগানে যুদ্ধের সময়েও বক্তৃতা দিয়েছি। আমি হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট জেম্স ব্রায়ান্ট কনাল্টের সঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছি। এমন কি মূল ফরাসি ভাষাতেও তা করেছি।

'আমার ধারণা শ্রোতারা কি শুনতে চায়, আর তা কিভাবে বলা হবে, তা আমি জানি। আমার মনে হয় একজন দক্ষ ব্যবসায়ী যদি ব্যবসায় দায়িত্ব নিতে পারেন তাঁর পক্ষে অন্য কিছু শেখা কঠিন নয়।'

মি. র‍্যান্ডালের সঙ্গে আমি একমত। একজন ভালো বক্তা হওয়ার কাজে সাফল্যের ইচ্ছা অনেকটাই এগিয়ে দেয়। আমি যদি আপনাদের মনের ইচ্ছা সম্পর্কে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতাম তাহলে বলে দিতে পারতাম নিশ্চিত ভাবেই, সাফল্য লাভ করতে আপনার কত সময় প্রয়োজন।

তাই একাজে সফল হতে আপনার চাই উপযুক্ত কিছু গুণাবলী। এটা যে কোন দরকারী কাজেই প্রয়োজন হয়। পর্বত ডিঙিয়ে যেতেও চাই উদগ্র একটা ইচ্ছার মত কিছু।

জুলিয়াস সীজার যখন গলা থেকে চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে হাজির হন তখন তাঁর সেনাদলের বিজয়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেন জানেন? খুব একটা চালাকির কাজই তিনি করেন। তিনি ডোভারের মুখে এক উঁচু জায়গায় থামেননিচে তাকাতে তাঁদের চোখে পড়ে, যে জাহাজে চড়ে তারা এসেছিলেন তার সবই লেলিহান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে

গেছে। শত্রু দেশে সব সংযোগ নিশ্চিহ্ন, পালাবার পথও নেই–অতএব একটা কাজই করার ছিল : এগিয়ে চলা-জয় করার জন্য। আর ঠিক তাই তিনি করেন।

অমর সীজারের এমনই ছিল মনের জোর। আপনিও তাই করুন না কেন, শ্রোতাদের ভয় জয় করার মধ্য দিয়ে।

৪। যতটা সম্ভব অভ্যাস করুন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আমার যে পাঠ্যক্রম চালু করেছিলাম আজ তা পুরোপুরি বদলে গেছে। প্রতি বছরই নতুন ধ্যান ধারণা পুরনোগুলো বদলে গেছে। তবে পাঠক্রমের একটা বিষয় অপরিবর্তিত থেকে গেছে। ক্লাসের প্রত্যেককেই অন্ততঃ একবার উঠে দাঁড়িয়ে, বেশির ভাগই দুবার, ক্লাসের সকলের সামনে বক্তৃতা দিতে হয়। কেন? এটা সেই জলে না নেমে যেমন সাঁতার শেখা যায় না তেমনই–অর্থাৎ মানুষের সামনে বক্তৃতা না দিলে কেউ বক্তা হতে পারে না। আপনি বক্তৃতা করা সম্পর্কে মোটা মোটা বই পড়তে পারেন–এ বইয়ের সঙ্গেও –অথচ বক্তৃতা দান না করতেও পারেন। এ বইটা একটা গাইড বই মাত্র। আপনাকে এর নির্দেশ অভ্যাস করতে হবে।

জর্জ বার্নার্ডশ'কে যখন প্রশ্ন করা হয় এমন চমৎকারভাবে জনগণের সামনে তিনি কিভাবে বক্তৃতা করেন, তিনি জবাব দেন : 'স্কেট করা যেভাবে শিখেছি সেই ভাবেই একগুয়ের মত নেহাত বোকার মতই অভ্যাস করে শিখেছি বক্তৃতা করা। যৌবনে শ ছিলেন অত্যন্ত ভীরু। কারও বাড়িতে ঢোকার আগে রাস্তায় অন্ততঃ বিশ মিনিট ঘোরাঘুরি করতেন। খুব কম লোকই আমার মত কাপুরুষ ছিল আর এমন লজ্জা পেত', শ স্বীকার

করেছেন। শেষ পর্যন্ত শ ভীরুতা, আর কাপুরুষতা জয় করার সেরা পথই বেছে নিয়েছিরেন। তিনি তাঁর দুর্বলতাকে জয় করতে চাইলেন। একটা বিতর্ক সভায় তিনি যোগ দিলেন। লণ্ডনের প্রায় সব সভায়, যেখানে আলোচনার সুযোগ থাকত সেখানেই যোগ দিতে লাগলেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালাতে মনপ্রাণ ঢেলে জর্জ বার্নার্ড শ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন চমৎকার সুদক্ষ বক্তা হয়ে উঠেছিলেন।

কথা বলার সুযোগ চারপাশেই ছড়ানো। যে সব প্রতিষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ আছে তাতে যোগদান করুন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই যে কোন জনসভায় যোগ দিন। দপ্তরের কোন সভায় পিছনের আসনে থাকবেন না। বেশ জোরালো স্বরেই আপনার বক্তব্য রাখুন। কথা বলুন! রবিবারের শিক্ষাদানের ক্লাসে শিক্ষাদানও করুন। ভালো করে নজর রাখলে দেখবেন আপনার চারপাশে ব্যবসা, সামাজিক, রাজনৈতিক পেশাদারী বা এমন কি আপনার এলাকাতেও কথা বলার দারুণ সুযোগ রয়েছে। কথা না বললে আপনার জানা অসম্ভব কতটা উন্নতি লাভ করতে পারলেন। তাই শুধু কথা বলে যান বারবার।

একজন তরুন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্তা আমায় বলেছিলেন, এ ব্যাপার আমার জানা, কিন্তু শেখার অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না।

'অগ্নিপরীক্ষা!' আমি জবাব দিই। কথাটা মন থেকে হটিয়ে দিন। আপনি ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারেন নি।"

'ঠিক চিন্তাটা কেমন?' তাঁর প্রশ্ন ছিল।

'একটা অ্যাডভেঞ্চারের চিন্তা' জবাব দিই।

আপনিও তা করতে পারেন।

২. আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা

জনসংযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল ভয়। আমি এমন একজনকে জানি যিনি আমার ক্লাসে যোগ দেননি কারণ তাঁকে কথা বলতে হবে। পাঁচ বছর পরে অবশ্য তিনি যোগ দিয়ে পাঁচটা বছর নষ্ট হওয়ার জন্য দুঃখও করেন। আজ তিনি একজন বিখ্যাত বক্তা।

এমার্সন বলেছেন, পৃথিবীতে ভয়ের মত আর কিছু মানুষের ক্ষতি করে না। কথাটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, কারণ ১৯১২ সাল থেকে শিক্ষাদান করে এ অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি।

স্ত্রী পুরুষকে জনগণের সামনে বক্তৃতা করা শেখাতে গিয়ে আমি ভয় দূর করার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার পথ আবিষ্কার করেছি। এজন্য শুধু দরকার কয়েক সপ্তাহের অভ্যাস।

১. বক্তৃতার ভীতি সম্বন্ধে নানা ঘটনার খোঁজ রাখুন।

এক নম্বর ঘটনা :

বক্তৃতা সম্বন্ধে একমাত্র আপনিই ভীত নন। কলেজে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে বক্তৃতার ক্লাসে শতকরা আশি কি নব্বই ভাগ ছাত্রেরই গোড়ায় এই ভয় থাকে। আমার আরও ধারণা বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ ভয় শতকরা একশ ভাগ।

দুই নম্বর ঘটনা :

একটু মঞ্চভীতি থাকা কাজের হয়। আমাদের পারিপার্শ্বিকতা মেনে নেওয়ার জন্য প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা তৈরি হওয়ার ব্যাপার থাকে। তাই যখন দেখবেন নাড়ীর গতি বেড়ে উঠে ঘামতে শুরু করেছেন, তাতে ভয় পাবেন না। আপনার শরীর বাইরের উত্তেজনায় কাজ করতে তৈরি। এই শারীরিক ব্যাপারটা একটা সীমানার মধ্যে থাকলে আপনি বেশ ভালোভাবেই পরিষ্কারভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলে যেতে পারবেন।

তিন নম্বর ঘটনা :

বহু পেশাদার বক্তা আমাকে বলেছেন তারাও পুরোপুরি ভয়কে জয় করতে পারেন না। এ রকম অবস্থা প্রতিবার প্রথম কথা শুরুর সময় বেশ কিছুক্ষণ থেকে যায়। যে সব বক্তা বলেন ভয় বলে কোন প্রতিক্রিয়া তাদের হয় না তারা নেহাত বাচাল।

চার নম্বর ঘটনা :

জনতার সামনে বক্তৃতা করতে ভয় পাওয়ার কারণই হল আপনি একাজে অনভ্যস্ত। বেশির ভাগ মানুষেরই জন-সংযোগের অভিজ্ঞতা থাকে না তাই ভয় তাদের আঁকড়ে ধরে। শিক্ষানবীশদের কাছে এটা টেনিস খেলা বা গাড়ি চালানোর মত। এই ভয় কাটানোর একমাত্র পথই হল কেবল অভ্যাস চালিয়ে যাওয়া। দেখবেন বক্তৃতা ব্যাপারটা আনন্দের খনি হয়ে উঠতে পারে।

২. সঠিকভাবে নিজেকে তৈরি করুন।

মনে পড়ছে একবার বেশ ক'বছর আগে নিউইয়র্ক রোটারী ক্লাবের মধ্যাহ্নভোজে একজন নামী সরকারী অফিসার প্রধান বক্তা হিসেবে আসেন। আমরা সাগ্রাহ অপেক্ষায় ছিলাম তিনি কি বলেন শুনব। বলে।

প্রথমেই বুঝতে পারা গেল ভদ্রলোক তৈরি নন। প্রথমে তিনি মন থেকেই বলার চেষ্টা করলেন, তাতে ব্যর্থ হয়ে পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করলেন। অবশ্য তাতেও সুবিধে হল না। যতই তিনি বলতে চেষ্টা করলেন ততই সব তাঁর গুলিয়ে যেতে লাগল। বারবার ক্ষমা চেয়ে তিনি কাঁপা ঠোঁটে কিছু বলতে চাইছিলেন। বেচারি ভয়ে একেবারে শুকিয়ে কাঠ, বোঝা যাচ্ছিল একদম তৈরি হয়ে আসেন নি। শেষ পর্যন্ত হতমান অবস্থায় তিনি বসে পড়লেন।

১৯১২ সাল থেকে প্রায় বছরে পাঁচ হাজার বক্তৃতা আমাকে তদারক করতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে এভারেস্টের চূড়োর মতই একটা ব্যাপার মাথা তুলে আছে : একমাত্র তৈরি হয়ে আসা বক্তারাই আত্মবিশ্বাসী হন। দুর্বল অস্ত্র নিয়ে কেউ কিভাবে কোন ভয়ের দূর্গ জয় করা ভাবতে পারে? লিঙ্কন বলেছিলেন :”আমার বিশ্বাস কোন কিছু বলার না থাকলে বলতে গেলে অসোয়াস্তি না বোধ করে পারব না।”

ড্যানিয়েল ওয়েবন্টার বলেছিলেন অর্ধেক তৈরি হয়ে শ্রোতাদের সামনে যাওয়ার কথা ভাবলে মনে হয় অর্ধেক পোশাক পরে হাজির হয়েছি।

বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করবেন না

'ভালোভাবে তৈরী' বলতে কি জানি বলছি বক্তৃতাটা একদম মনে গেঁথে রাখবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেব বেশ জোরালো ভাবে 'না' বলে। নিজেদের অহমিকাকে রক্ষা করতে আর পাছে শ্রোতাদের সামনে কথা ভুলে যান সেই কারণে বহু বক্তা মুখস্থ করার ফাঁদে পা দেন। কোন ভাবে এই নেশার বশীভূত হলে বক্তা বরাবরের মতই সময় নষ্ট করার মধ্যে আর মঞ্চে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে ব্যর্থ হন।

আমেরিকার সংবাদ ঘোষকদের ডীন এইচ. ভি. ক্যাপ্টেনবর্ণ যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। জেন্টলম্যান, দি কিং' নামে একটা ছোট গল্প তিনি বেছে নিয়ে প্রায় শ'খানেক বার রিহার্সাল দিয়ে সেটা একেবারে কণ্ঠস্থ করে রাখেন। প্রতিযোগিতার দিন তিনি সব ভুলে গেলেন। শুধু ভুলে যাননি, তাঁর মন একদম শূন্যতায় ভরে গেল। ভয়ে তিনি একেবারে আধমরা। হতাশায় মরীয়া হয়ে তিনি মন থেকেই গল্পটা বলে গেলেন। তাঁর অবাক লাগল যখন বিচারকরা তাঁকেই প্রথম পুরস্কার দিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কাল্টেনবর্ণ আর কখনও কোন বক্তৃতা মুখস্থ করেন নি। তার ঘোষক জীবনে সাফল্যের এটাই হল গোপন পথ। সামান্য কিছু নোট রেখে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই, শ্রোতাদের সামনে কথা বলেন।

যে লোক আগে শিখে সেটা মুখস্থ করতে চান তিনি শুধু সময় আর শক্তিই ক্ষয় করেন আর এর পরিণতিতে আসে ব্যর্থতা। আমরা সারা জীবন ধরেই স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে কথা বলি। আমরা কথাগুলো আগে ভাবিনা, আমরা কেবল কিছু ধারণা করে রাখি, ব্যাস। আমাদের ধারণা স্পষ্ট হলে কথাগুলো স্বাভাবিক ভাবেই অবচেতনায় যেভাবে শ্বাস নিই সেইভাবেই এসে পড়ে।

এ ব্যাপারটি এমন কি উইনষ্টন চার্চিলকেও বেশ কঠিন পথে শিখতে হয়। তরুণ বয়সে চার্চিল তার বক্তৃতা লিখে মুখস্থ করতেন। এরপর একদিন যখন তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মুখস্থ করা ভাষণ দিচ্ছিলেন আচমকা তার সব গোলমাল হয়ে গেল। তার মনে একবারে অন্ধকার নেমে এল। বেশ হতচকিত হয়ে, তিনি অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। শেষ কথাগুলো তিনি বারবার বলতে লাগলেন আবার সব গোলমাল হয়ে মুখ লাল করে, তিনি বসে পড়লেন। সেই থেকে শেষ অবধি উইনষ্টন চার্চিল কোনদিনই আর মুখস্থ করা বক্তৃতা করেন নি।

আমরা যদি আমাদের ভাষণ বা কথার প্রতিটি শব্দ আগে মুখস্থ করে রাখি তাহলে সম্ভবতঃ শ্রোতাদের মুখোমুখি হলেই তা ভুলে যাব। যদি ভুলে নাও যাই তাহলে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ভাবেই তা বলে যাব। কেন? কারণ ওই বক্তৃতা আমাদের অন্তর থেকে আসবে না। আসবে স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে। লোকজনের সঙ্গে আমরা যখন একান্তে কথা বলি তখন আমরা ভাবি যা বলতে চাই, তারপর বলতে শুরু করলেই কথুলো আপনা আপনি বেরিয়ে আসে। সারা জীবনে সব সময় তাই করি আমরা। সেটা আজ বদলানোর দরকার কি? যদি আমরা আগে বক্তৃতা মুখস্থ করে রাখি তাহলে ভ্যান্স বুশনেলের অভিজ্ঞতাই আমাদের জুটবে।

ভ্যান্স প্যারীর বো আর্ট স্কুলের ছাত্র, পরে তিনি হন বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ইকুইটেবল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট। অনেক বছর আগে তাকে আহ্বান করা হয় সারা আমেরিকার দু হাজার বীমা সংক্রান্ত প্রতিনিধিদের

সভায় ভাষণ দিতে। জীবন বীমার কাজে মাত্র দু'বছর থাকলেও তাঁকে বিশ মিনিট বলার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ভ্যান্স খুবই খুশি হলেন। ভাবলেন এতে তার সম্মান বাড়বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বক্তৃতাটা লিখে মুখস্থ করে রাখলেন। আয়নার সামনে অন্ততঃ চল্লিশবার তিনি রিহার্সালও দিলেন। মুখ চোখের ভঙ্গী, কায়দা সবই তাঁর নিখুঁত মনে হল।

যাই হোক, তিনি যখন বক্তৃতা দেবার জন্য মঞ্চে উঠলেন তখন প্রচণ্ড ভয় পেলেন। তিনি একইভাবে শুরু করলেন 'এই অনুষ্ঠানে আমার কাজ হ'ল...।' ব্যাস এখানেই তিনি সব ভুলে গেলেন। তিনি আবার গোড়া থেকে শুরু করার চেষ্টা করলেন। অনেক কসরৎ করে আবার এগিয়ে গেলেন। বারবার তিনবার তিনি এরকম করলেন : মঞ্চটা চার ফিট উঁচু ছিল আর পিছন দিকে কোন রেলিঙ ছিল না চারবারের মাথায় তিনি যেই পিছিয়ে এলেন, তখনই উল্টে পড়ে একদম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন ব্যাপার দেখে। একজন শ্রোতা চেয়ার থেকে উঠে উল্টে পড়ে মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে কেউ এমন মজার দৃশ্য দেখে নি। এ ঘটনার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল শ্রোতারা ধরেই নিয়েছিলেন এটা এক ধরনের অভিনয়। প্রাচীন কর্মীরা এখনও এটা নিয়ে সরস আলোচনা করে থাকেন।

কিন্তু বেচারি বক্তা ভ্যান্স বুশনেলের কি হল? ভ্যান্স বুশনেল আমায় বলেছিলেন এই ঘটনা তার জীবনের সবচেয়ে অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি। তিনি এতই অপমানবোধ করেন যে পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেন।

ভ্যান্স বুশনেলের উপরওয়ালারা তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিরস্ত করেন। তাঁরা তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করলেন। পরে ভ্যান্স বুশনেল তাঁর প্রতিষ্ঠানে একজন দক্ষ বক্তা হয়ে ওঠেন। কিন্তু জীবনে তিনি আর বক্তৃতা মুখস্ত করেন নি। তার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জ্ঞানলাভ করি আসুন।

আমি অসংখ্য মানুষকে মুখস্থ করা ভাষণ শোনাতে দেখেছি। তবে এমন একজনকেও দেখিনি মুখস্থ করা ছেড়ে কেউ মানুষের মত আচরণ করে কথা বলেছেন। এটা করলেও তাঁকে মানবিক বলতে পারতাম। হয়তো এতে তার একটু অসুবিধা হত তবে তাতে কাজ হত।

লিঙ্কন একবার বলেছিলেন আমি কাউকে মুখস্থ করার উপদেশ শোনাতে দেখতে চাই না। আমি চাই সে খোলামেলা ভাবেই বক্তব্য রাখুক।'

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন, যুদ্ধ হল একটা শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানও। আগে থেকে পরিকল্পনা না করলে তা ব্যর্থ হয়। বক্তৃতার ব্যাপারেও তাই। এটা অনেকটা ভ্রমণের মত। শুরু না করলে শেষ হয় না।

বক্তৃতার বিষয়বস্তু তৈরি করার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই।

এমন কোন ছক নেই যা সব রকম সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবুও এমন একটা ব্যবস্থার কথা ডঃ রাসেল এইচ. কনওয়েল তার এভারস্ অব ডায়মণ্ড' গ্রন্থে বলে গেছেন যা অনেকেরই কাজে লাগতে পারে।

কনওয়েল বলেছেন : ১। আপনারা জানা তথ্যগুলো গুছিয়ে বলুন। ২। এর ওপর আলোচনা করুন। ৩। এগুলো কাজে লাগাতে অনুরোধ করুন। এই পাঠক্রমে ছাত্ররা নিচের পদ্ধতি কার্যকর বলে অনুভব করেছেন ১। অন্যায় বা ভুল ধরিয়ে দিন। ২। প্রতিকারের পথটি দেখাতে চেষ্টা করুন। ৩। সহযোগিতার আবেদন রাখুন।

আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন : ১। শ্রোতাদের আগ্রহী করে তুলুন। ২। তাদের বিশ্বাস অর্জন করুন। ৩। আপনার বক্তব্য রাখুন-শ্রোতাদের আপনার বক্তব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত করুন। ৪। শ্রোতাদের কাছে এমনভাবে আবেদন রাখুন যাতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়।

বন্ধুদের সঙ্গে রিহার্সেল দিন

যে বক্তব্য আপনি রাখতে চলেছেন সেটা ঠিক করে রেখেছেন তো? এটাই হল প্রথম ধাপ। যে বিষয়ে আপনি বলবেন মনস্থ করেছেন সুযোগ পেলেই প্রাত্যহিক জীবনে বন্ধুবান্ধব বা কর্মক্ষেত্রের সহযোগীদের সঙ্গে সেটা ঝালিয়ে নিন। এ এক নিখুঁত পদ্ধতি। এভাবে কথা বললে অন্য কারও কাছ থেকে নতুন কোন কিছু জানতেও পারেন, আর তা হবে অমূল্য।

সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হন

বইয়ের গোড়াতেও এই বিষয় উল্লেখ করেছি। এটা অবশ্য করণীয়। কোন বিষয় বেছে নেওয়ার পর আপনাকে বিষয়ের মধ্যে একাত্ম হতে হবে। আপনার আচরণ এমন হবে

যা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের যুগযুগ ধরে প্রেরণা জুগিয়েছে। আপনার উদ্দেশ্যের উপর আশা রাখতে হবে।

মনে রাখবেন আপনার বক্তব্যের মাঝখানে কোন ব্যাকরণগত ভুল বা এ ধরনের ত্রুটি থাকলেও সেদিকে নজর দেবেন না। নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন। আপনার বক্তব্য শ্রোতাদের কতখানি আবিষ্ট রাখতে পারে সেটা দেখাই আপনার কর্তব্য। সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হওয়াই আপনার প্রয়োজন। সেটাই করুন।

আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুন

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর উইলিয়াম জেমস বলেছেন : ক্রিয়া অনুভূতিকে অনুসরণ করে চলে, কিন্তু বাস্তবে ক্রিয়া আর অনুভূতি একসঙ্গেই চলে। যা ইচ্ছার অনুবর্তী, তাই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা পরোক্ষভাবে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

'অতএব মনে সাহস আনতে হলে আমাদের এখন ব্যবহার করতে হবে যাতে আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। আর এটা করলেই ভয় দূর হয়ে যাবে।'

আপনাকে তাই প্রফেসর জেমসের উপদেশ কাজে লাগাতে হবে। যখন শ্রোতাদের সামনে এসে সাহস আনতে চাইবেন তখন এমন ভাব করুন যেন কিছুই হয়নি। অবশ্য আপনি তৈরী না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিতেও কাজ হবে না। কিন্তু যদি কি বললেন জানা থাকে তাহলে বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যান আর গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিন। আসলে শ্রোতাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে ত্রিশ সেকেণ্ড গভীর শ্বাস টানুন।

অতিরিক্ত মাত্রার অক্সিজেন আপনাকে উজ্জীবিত করে মনে সাহস সঞ্চার করবে। এতে আপনার নার্ভাস ভাবটা চলে যাবে।

এবার শ্রোতাদের সামনে সটান দাঁড়িয়ে, যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে কথা আরম্ভ করুন। আপনার যদি মনে সন্দেহ থাকে এই দর্শন কোন কাজেই নয় তাহলে বলব আপনার ক্লাসের যে কোন সহপাঠির সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলার পরেই আপনার মনের পরিবর্তন ঘটবে। যেহেতু আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। আপনাকে বিখ্যাত একজন আমেরিকানের উপদেশ শুনতে বলছি। তিনি সাহসের প্রতীক। একদিন তিনি অতি ভীরু মানুষ ছিলেন, অথচ কালে কালে হয়ে ওঠেন অত্যন্ত সাহসী, বিশ্বস্ত, শ্রোতাদের প্রিয় মানুষ। তিনি হলেন আমেরিকার একদা প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট।

তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : ছোটবেলায় আমি রুগ্ন ছিলাম। তরুণ বয়সেও আমি ছিলাম নার্ভাস আর কোন কাজে সাহস পেতাম না। আমাকে তাই প্রচুর পরিশ্রম করে শরীর আর মন তাজা করতে হয়। ছেলে বয়সে একটা বইতে পড়েছিলাম এক ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন নাবিককে কিভাবে নির্ভয় হতে হয় শেখাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষ কাজ করতে গিয়ে ভীত হয়। তাকে যা করতে হবে তা হল ভয়ের কথা না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এইভাবেই একদিন তাকে জয় করা সম্ভব হবে!

এই নীতির উপর নির্ভর করেই আমি এগিয়ে যাই। প্রথমে অনেক কিছুতেই আমার ভয় ছিল, গ্রিমলিভালুক থেকে বুনো ঘোড়া আর বন্দুকবাজ পর্যন্ত। কিন্তু ভয় পাবো না ভেবে এগিয়ে ক্রমে ভয় জয় করেছিলাম। ইচ্ছে করলেই যে কোন মানুষ এটা পারে।

জনসংযোগের ভীতি দূর করার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমাদের প্রতিদিনের কাজে অদ্ভুত রকম প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ যারা গ্রহণ করতে পারেন তারাই শ্রেষ্ঠতর মানুষ। তারা যে কোন শ্রোতাদের জয় করার ফলে তাদের জীবন আনন্দময় আর পূর্ণতায় বিকশিত।

একজন বিক্রেতা লিখেছেন : 'ক্লাসে কয়েকবার দাঁড়িয়ে বলার পর আমার মনে হল যে কোন কাউকেই সামলাতে পারি। একদিন সকালে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কড়া একজন ক্রয় এজেন্টের সামনে হাজির হলাম। লোকটি না বসার আগেই সবার আগে আমার সব স্যাম্পেন তার ডেস্কে ছড়িয়ে দিলাম। তিনি এরপর আমাকে এমন বায়না দিলেন সারা জীবনেও যা পাইনি।'

এক গৃহকর্ত্রী আমায় বলেন আমি আমার বাড়িতে পড়শীদের নিমন্ত্রণ জানাতে ভয় পেতাম। কারণ কথাবার্তা চালাতে পারব না বলে আমার ভয় লাগতো। ক্লাসে যোগ দিয়ে বার কয়েক উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলার পরে আমার সাহস বাড়ল। এরপর একদিন একটি পার্টি দিলাম। পার্টি দারুণ জমলো, আমি সকলকে চমৎকার মাতিয়ে রেখেছিলাম।'

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনিও তা পারবেন। আপনিও দেখবেন জনসংযোগ আর বক্তৃতা করতে পারলে প্রতিদিনই ভয় জয় করে আপনি আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলছেন। এর

ফলে প্রতিদিনের জীবনের নানা সমস্যা আর জটিলতা জয় করতে আপনার অসুবিধা থাকবে না। যে সমস্যা আগে দূর করা যায়নি তার সমাধান করে জীবন আপনার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

৩. দ্রুত ও সহজে বক্তব্য রাখার পথ

দিনে আমি হঠাৎ কখনো কখনো টেলিভিশন দেখি। কিন্তু আমার একজন বন্ধু বিকেলের একটা অনুষ্ঠান দেখতে অনুরোধ জানাল একদিন। অনুষ্ঠানটা গৃহকর্ত্রীর জন্য এবং একটু উচ্চস্তরের তাই বন্ধুর ধারণা

অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া আমার দেখা উচিত। সত্যিই তাই মনে হল। অনুষ্ঠানটা বেশ কয়েকবার দেখলাম আমি। যারা কথা বলছিলেন তারা কেউই পেশাদার বক্তা নন। তাঁদের বক্তৃতার শিক্ষা ছিল না তবুও তাঁদের কাজ অত্যন্ত শিষ্টাচার পূর্ণ। কথা বলার সময় তারা সকলেই ভয় কাটিয়ে উঠেছিলেন।

এর কারণ কি? কারণটা আমি জানি কারণ বহু বছর ধরেই এ ধরণের ক্লাস আমাকে নিতে হয়েছে। এই সব মানুষরা সকলেই অতি সাধারণ স্ত্রী পুরুষ অথচ তারা সারা দেশের দর্শকদের আকর্ষণ করে চলেছেন। তাঁরা বলে যান তাঁদের নিজেদেরই কথা। তাঁদের জীবনের কোন বিসদৃশ মুহূর্ত, কোন আনন্দময় ঘটনা। কিভাবে স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, ইত্যাদির কাহিনী। এসব বলতে গিয়ে তাঁদের বাক্যবিন্যাস বা ব্যাকরণগত দিক নিয়ে ভাবতে হয়নি। অথচ তা সত্বেও তারা দর্শককুলের বাহবা পেয়ে চলেন। এটাই আমার কাছে জনসংযোগের তিনটি নাটকীয় নিয়ম :

১. অভিজ্ঞতা বা শেখার মধ্য দিয়ে জানা বিষয়ে কথা বলুন

টেলিভিশনে যারা কথা বলেছিলেন তাঁরা সবাই তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তারা তাদের জানা কথাই বলছিলেন। একবার ভাবুন তাঁদের যদি, কমিউনিজম বা রাষ্ট্রসঙঘ সম্বন্ধে বলতে বলা হত তাহলে কি দাঁড়াত। সমগ্র অনুষ্ঠানই জলো হয়ে উঠত। অথচ হাজার হাজার অনুষ্ঠানে বক্তারা এই ভুলই করেন। তারা ভাবেন যা বলতে হবে তা হল নতুন নব বিষয়ে, অথচ তাদের ওই সব বিষয়ে হয়তো জ্ঞানই নেই। তারা বেছে নেন স্বদেশিকতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ইত্যাদি। বক্তৃতা তৈরী করতে তাঁরা পাগলের মত ঘটতে থাকেন উদ্ধৃতি। তাঁরা আদৌ ভাবেন না শ্রোতারা হয়তো ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতালব্ধ কথাই শুনতে চাইবেন, বড় বড় বাক্যবিন্যাস নয়।

শিকাগোয় ডেল কার্নেগী পাঠক্রমের এক ক্লাসে কয়েক বছর আগে একজন ছাত্রবক্তা কিছু বলতে গিয়ে এইভাবে শুরু করে : স্বাধীনতা, মমতা আর ভ্রাতৃত্ব। মানুষের ইতিহাসে এসবই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধারণা। স্বাধীনতা ছাড়া জীবন বৃথা।

এ পর্যন্ত বলার পরেই শিক্ষক, তাঁকে থামিয়ে দেন তারপর প্রশ্ন করেন যে কথা তিনি বলছেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোন রকম অভিজ্ঞতা আছে কিনা। ছাত্রটি তখন এক অদ্ভুত কথা শোনায়।

তিনি ছিলেন এক ফরাসী গেরিলা যোদ্ধা। তিনি আমাদের এবার শোনান তিনি ও তাঁর পরিবার নাশীদের হাতে কিভাবে অসম্মান লাভ করেন। সজীব ভঙ্গীতে তিনি আমাদের শোনালেন কিভাবে সিক্রেট পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে আসেন। তিনি বলেছিলেন 'আমি আজ যখন মিশিগান অ্যাভিনিউ দিয়ে এই হোটেলে আসছিলাম কোন

পুলিশ আমার দিকে তাকায়নি। আজ আমি যেখানে খুশি যেতে পারি। আজ বুঝেছি স্বাধীনতার মূল্য কি। ছাত্রটি শ্রোতাদের কাছ থেকে বিরাট প্রশংসাই পান।

জীবনে যা শিখেছেন তাই শোনান

যে সব বক্তা জীবন তাদের কি শিখিয়েছে যখন শোনাতে চান শ্রোতারা তাদের কথা শুনতে খুবই আগ্রহী হন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি বক্তারা কথাটা সহজ মেনে নিতে চায় না-তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ বলেই ভাবেন। তারা বরং সাধারণভাবে দার্শনিকতত্ত্বের দিকে বেশি ঝুঁকতে ইচ্ছুক। তারা যখন কোন সম্পাদকীয় লেখেন আমরা তা পড়তে চাই এটা ঠিক। তবে সেটা যোগ্য লোকের হাত থেকেই আসুক তাই আমরা চাই। তবুও আসল কথাটা হল এই : জীবন আপনাকে যা শিখিয়েছে তাই শোনান তাহলে আমিই হব আপনার শ্রোতা।

শোনা যায় এমার্সন সব সময়েই লোকের কথা শুনতেন, তা সে যত সামান্যই হোক। এর কারণ হল তাঁর মনে হত, যে কোন মানুষের কাছ থেকেই তার কিছু শেখার আছে। আমি প্রচুর বয়স্ক মানুষদের বক্তৃতা আর কথা শুনেছি, তাই বলতে পারি বক্তা যখন জীবন তাকে যা শিখিয়াছে তাই শোনাতে চান তখন সে কথা কখনই বিরক্তিকর মনে হয় না।

নিজের অতীত থেকে কাহিনী সংগ্রহ করুন

একবার আমাদের কিছু শিক্ষককে লিখতে বলা হয় বক্তা হয়ে ওঠার কাজে সবচেয়ে বড় কোন সমস্যার তারা মুখোমুখি হন। লেখাগুলো যাচাই করে দেখা যায় প্রায় সব কটিতেই একই রকম কথা লেখা : প্রথম শিক্ষার্থীদের সঠিক বক্তৃতার বিষয় জানানো।

সঠিক বিষয়টি কি? আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন ঠিক বিষয় আপনার জীবনেই নিহিত আছে, আপনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা উপলব্ধি করতে পারেন? সেটা কিভাবে খুঁজে পাবেন? অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করার মধ্য দিয়েই তা পাবেন–কারণ যে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আপনার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে সেটাই সেই বিষয় হতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে আমরা এই বিষয় সম্পর্কে সমীক্ষা চালাই। যে বিষয় শ্রোতাদের প্রিয়, দেখা যায় কারও অতীত জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই শ্রোতাদের প্রিয় হতে চায়। এটা হয় নিচের বর্ণনা মতই :

প্রথম জীবন ও গড়ে ওঠা, যে সব বিষয়ে পরিবার, শৈশব স্মৃতি, স্কুলের দিনগুলো থাকে সেগুলোই শ্রোতাদের আকর্ষণ করে। এর কারণ আমরা জানতে চাই মানুষ কিভাবে সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে।

যখনই সুযোগ পাবেন অতীতের ঘটনা থেকে উদাহরণ রাখার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন শ্রোতাদের কাছে এর আকর্ষণ সর্বদাই অসামান্য।

এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক লড়াই : এই কথা কটি বেশ মানবিক আগ্রহে পরিপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাই বেশ সহজেই শ্রোতাদের আকর্ষণ করা সম্ভব নিজের অতীত জীবনের লড়াইয়ের কাহিনী উল্লেখের মধ্য দিয়ে। কিভাবে বিশেষ কোন কাজে যোগ দিতে

পেরেছিলেন? আপনার কর্মজীবনে কি ধরণের অবস্থার মুখোমুখি হন? আপনার জীবনের নানা বাধা, আশা-আকাঙ্খ, জয়, প্রতিযোগিতাময় জীবনে এগিয়ে চলা সবই আগ্রহ জাগাতে পারে। কারও জীবনের সত্যিকার ঘটনার বিবরণ–নিশ্চিতভাবেই শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ।

শখ ও অবসর বিনোদন : এ বিষয়ে জড়িত থাকে ব্যক্তিগত পছন্দ তাই মানুষের আগ্রহ আকর্ষণও করে। আনন্দের জন্য আপনি যা করেন তা অন্যের কাছে আদরণীয় হওয়াই সম্ভব।

জ্ঞানের বিশেষ এলাকা : কোন বিশেষ বিষয়ে কাজ করায় আপনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ওই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আপনার কাহিনীর বর্ণনা শ্রোতারা গ্রহণ করবেই।

অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা : কোনদিন কোন বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন? যুদ্ধের ভয়ঙ্করতার সামনে এসেছেন? বা অন্য কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সামনে পড়েছেন? বক্তৃতার ক্ষেত্রে এই সব বিষয় চমৎকার কাজ দেয়।

বিশ্বাস ও ধারণা : আপনি অবশ্যই আজকের দুনিয়ার নানা সমস্যা সম্বন্ধে আপনার অবস্থা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার ধ্যান ধারণার কথা অনায়াসেই বলতে পারেন। শ্রোতাদের চেয়ে কোন বিষয়ে সামান্য বেশি জানা থাকলে সেটা সম্বন্ধে না বলাই ভালো। অন্যদিকে অন্য কোন বিষয়ে আপনার ভালো রকম জ্ঞান থাকলে এটাই হবে আপনার বিষয়। অবশ্য সেটাই কাজে লাগান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ যেমন বলা হয়েছে কোন বক্তৃতায় শুধু যান্ত্রিক কিছু শব্দ আর বাক্যই থাকে না বা মুখস্থ করলেই চলে না বক্তৃতা মানে কারও ধার করা বাণী বা কাগজের খবর বলে যাওয়া নয়। এর মধ্যে থাকতে হবে আপনার মনের মধ্যে জমা থাকা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার নির্যাস। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। ওই সম্পদ আহরণ করে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে শ্রোতাদের জন্য। এ ধরনের বক্তৃতা সত্যিই উপভোগ্য।

এবার আপনি বক্তৃতার মূল অনুধাবণ করতে পেরেছেন। তাই আসুন এর জন্য দ্বিতীয় যে নিয়মটি প্রয়োজন তাই দেখা যাক :

নিজের বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী থাকা চাই

আমি বা আপনি যে সব বিষয় নির্বাচন করি–অবশ্যই শ্রোতাদের সামনে বলার জন্য-সে সম্বন্ধে যে আমাদের পুরোপুরি আগ্রহ আর আকর্ষণ থাকে তা নয়। আমার কথা বলতে পারি যে আমি ডিস ধোয়ার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। তবে এটুকু বলি এ বিষয়ে যে বলতে খুব উত্তেজনা অনুভব করব তা কখনই নয়। তবুও আমি শুনেছি গৃহকর্মীরা এ ব্যাপারে চমৎকার বলতে পারেন। কাজটা সম্বন্ধে তারা এতই ঘৃণার ভাব পোষণ করেন যে আবহমান কালের অভিজ্ঞতা তাঁদের দক্ষতার হিমালয়ে তুলে দেয়। এর পরিণতিতে এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলনাবিহীন হয়ে ওঠে।

এবার একটা প্রশ্ন রাখব যাতে আপনি শ্রোতাদের সামনে বক্তব্য বিষয় নির্বাচন করতে আর আলোচনায় সাহায্য পাবেন। কেউ যদি শ্রোতাদের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি

আপনার বক্তব্য মানতে অস্বীকার করে তাহলে কি আপনি আপনার বক্তব্যের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবেন? তা যদি পারেন তাহলে সেটাই হবে আপনার বিষয়।

সম্প্রতি আমার হাতে ১৯২০ সালে লেখা কিছু কাগজপত্র এসেছে। এগুলো আমি জেনেভায় রাষ্ট্রসঙে ঘর ৭ম অধিবেশনের সময় বেড়াতে গিয়ে লিখেছিলাম। একটা প্যারাগ্রাফ এই রকম : তিন চার জন প্রাণহীন বক্তা তাদের বক্তব্য পাঠ করার পর কানাডার স্যার জর্জ ফস্টার উঠে দাঁড়ালেন। বেশ খুশি হয়ে দেখলাম তার হাতে কোন কাগজ ছিল না। তিনি স্বতঃস্ফুর্ত ভঙ্গীতেই বলে চললেন। তাঁর বলবার পিছনে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য মেনে নেওয়ার চেষ্টাই করছিলেন। আমার পাঠক্রমে আমি যা শিক্ষা দিতে চাই তিনি সেকথাই বলছিলেন।

আমার প্রায়ই স্যার জর্জের সেই বক্তৃতার কথা মনে পড়ে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন, ভাল বক্তার পক্ষে যা একান্তই জরুরি।

আমাদের ক্লাসে কোন সদস্য যখন বলে কোন বিষয় সম্পর্কে আমার উত্তেজনা হয় না। অতি সাধারণ জীবনই আমি কাটিয়েছি, সেখানে উত্তেজনার কোন খোরাক ছিল না। শিক্ষক যখন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, অবসর সময়ে আপনি কি করেন। ছাত্রটি জবাবে জানায় সে দেশলাইয়ের বাক্স সগ্রহ করে। সে

আরও জানালো পৃথিবীর নানা দেশের দেশলাইয়ের বাক্স তার সংগ্রহে আছে। এ বিষয়ে সে নানা রকম বইও কিনেছে। কথা বলতে বলতে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষক তখনই তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার এই শখের বিষয়েই

আমাদের কিছু বলুন না কেন? দারুণ আগ্রহ জাগছে। ছাত্রটি জানালো কারও আগ্রহ জাগবে কিনা সে জানে না। ছাত্রটি শেষ পর্যন্ত তার শখের বিষয়েই চমৎকার বলে যাওয়ার পর শ্রোতারাও তা মন দিয়ে শুনলো। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় আন্তরিকতা সত্যিই প্রয়োজনীয় বিষয়। এবার তিন নম্বর নিময়টি এই রকম।

বক্তব্য বিষয়ে শ্রোতাদের একাত্ম হন

জনসংযোগের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় জড়িত থাকে : বক্তা, বক্তব্য আর শ্রোতা। প্রথম যে দুটি নিয়মের কথা এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বক্তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বক্তব্য রাখার অবস্থা আসেনি। বক্তা যখন তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের সামনে রাখতে আরম্ভ করেন তখনই কথা বলার অবস্থা প্রাণময় হয়ে ওঠে। বক্তার বক্তব্য হয়তো চমৎকার ভাবেই তৈরি করা হয়ে থাকতে পারে, বিষয়টাও এমন হতে পারে যাতে বক্তা উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু পুরোপুরি সাফল্য লাভ করার জন্য বক্তার বক্তব্য রাখার মাঝখানে আরও একটি বিষয় এসে পড়ে। বক্তাকে শ্রোতাদের অনুভব করতে দিতে হবে তিনি যা বলতে চলেছেন সেটা শ্রোতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই যে শুধু তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন তা নয়, তাঁর ওই উত্তেজনা শ্রোতাদের মধ্যেও জাগিয়ে তুলতে হবে। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সমস্ত বক্তাদের মধ্যেই এই আকর্ষণীয় রূপটি কাজ করে গেছে। একে প্রকাশ করার গুণ বা সেলসম্যানশিপ বা প্রচারের গুণ যাই বলুন না কেন। কার্যকর যে কোন বক্তাই ভেবে নেন আর কামনা করেন তাঁর শ্রোতারা তাঁর মতই অনুভব করেন, তাঁর মতে মত দেন, তাঁর মতই তিনি যা চান তাই তারা করুক আর তার অভিজ্ঞতা তাদের অভিজ্ঞ করে তুলুক। এই বক্তা হয়ে উঠবেন শ্রোতাদের যোগ্য, আত্মকেন্দ্রিক নয়। তিনি জানেন তাঁর

বক্তব্যের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করছে শ্রোতাদের মন আর হৃদয়ের মধ্যে, তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যেই শুধু নয়।

এমন একটা সময় ছিল যখন আমি জনসংযোগের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়মের উপর জোর দিতাম, কিন্তু সময় কেটে গেলে আমি বক্তব্য রাখার উপরেই জোর দিতে চেয়েছি।

প্রয়াত মিঃ ব্রায়ান বলেছেন, বাকপটুতা তাকেই বলা যায় বক্তা যা বলেন তা যখন জেনে বলেন ... জ্ঞানই এখানে শেষ কথা নয়, শেষ কথা হল বক্তা শ্রোতাদের কতটা একাত্ম করতে পেরেছেন তারই উপর। কোন বক্তাকে তার শ্রোতাদের ঠকানো অসম্ভব–বিশেষ করে তার মনোভাব নিয়ে ... প্রায় দু হাজার বছর আগে একজন লাতিন কবি চমৎকারভাবে কথাটা বলে গেছেন : 'শ্রোতাদের চোখে অশ্রু ঝরাতে চাইলে আপনার নিজের মধ্যেও সেই শোকের ছায়া আনতে হবে।'

আশ্চর্যের কথা জানেন কি? এমনকি ঘোড়াও উত্তেজিত কথায় বিচলিত হয়ে পড়ে। বিখ্যাত পশু শিক্ষক রেইনী বলেছেন ক্রুদ্ধ কথায় ঘোড়ার নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে দশবার বেড়ে যায়। শ্রোতারাও এই ঘোড়ার মতই স্পর্শকাতর।

এ ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা চাই। যতবারই আমরা বক্তব্য রাখি ততবারই আমরা শ্রোতাদের অভিব্যক্তি গড়ে তুলি। তারা আমাদেরই হাতে ক্রীড়নক।

বক্তার বক্তব্যের মধ্যে উত্তাপ, আবেগ, আন্তরিকতার স্পর্শ থাকলে তা বাষ্পের মতই ছড়িয়ে যায়। আমাদের পাঁচশ রকম ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু তাতে আমরা ব্যর্থ হব না।

বিখ্যাত রুবেনষ্টাইন বক্তৃতার মাঝখানে অসংখ্যা ভুল বলতেন তবুও তার কথা শ্রোতারা মন দিয়েই শুনতে চাইতেন।

৪. কথা বলার অধিকার অর্জন

বহু বছর আগে একজন দর্শনের অধ্যাপক আর বহু বছর আগের একজন নাবিক, বর্তমানের সাধারণ মানুষ নিউ ইয়র্কে আমার ক্লাসে যোগ দেন। অধ্যাপক ভদ্রলোক কলেজে নিযুক্ত ছিলেন আর নাবিকটি ছোট একটি ট্রাক ব্যবসায়ী। অথচ আশ্চর্যের কথা ওই ব্যবসায়ীর কথাই শ্রোতারা বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনতে চাইছিল, অধ্যাপকের বক্তব্য তাদের আকর্ষণ করেনি। এরকম হওয়ার কারণ কী? কলেজীয় ভদ্রলোক চমৎকার ইংরাজীতে বলছিলেন। তিনি শহুরে ভদ্রলোক, কৃষ্টিবান নিখুঁত চলাফেরা এবং তাঁর বক্তব্য আগাগোড়াই যুক্তিগ্রাহ্য আর পরিষ্কার। তবে তাঁর মধ্যে একটা জিনিসের অভাব ছিল–সঠিক বক্তব্য। তাঁর কথা আগাগোড়াই কেমন যেন অগোছালো আর অস্পষ্ট। তিনি তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মাঝখানে একেবারের জন্যও কোন উদাহরণ রাখেন নি। ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতার উদাহরণও রাখেন নি। তাঁর বক্তব্যের আগাগোড়া সরু সুতোয় গাঁধা কতগুলো এলোমেলো ধারণাই বোঝাতে চাইছিল।

অন্যদিকে ট্রাক ব্যবসার মালিক লোকটির ভাষা বেশ সোজা, নিটোল আর চমৎকার ছিল। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের উপরেই নির্ভর করে কথা বলতে চাইছিলেন। তিনি আমাদের কোন বিষয় বলতে গিয়েই তার ব্যবসায় কি ঘটেছিল সে কথার উল্লেখ করলেন। তাঁর বক্তব্য আর বাচনভঙ্গীর সজীবতা দারুণ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল শ্রোতাদের মনে।

আমি এ কাহিনীর উল্লেখ এজন্য করছি না যে কলেজীয় অধ্যাপক বা ট্রাক ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এটা কোন বিশেষ ব্যাপার। আমার এ কাহিনী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল

শ্রোতাদের আকর্ষণ করার কাজে উদাহরণ সম্পন্ন বক্তব্য কেমন কাজ দেয় তাই বোঝাতে।

শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বক্তব্যের বিষয়বস্তু তৈরি করতে যদি এই চারটি ধাপ তৈরি করতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেনই।

১. আপনার বক্তব্য বিষয় সীমায়িত রাখুন

আপনার বক্তব্যের বিষয় যখন ঠিক মনস্থ করা হয়ে যাবে, তখন আপনাকে যা করতে হবে তা হল কতখানি কি বলবেন তা ঠিক করা আর সেই সীমানায় থেকে যাওয়া। একটা কথা, কখনই ভুল করে এর বাইরের এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। একবার একজন তরুণ বক্তা দু মিনিটে 'খ্রষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের প্রথম থেকে কোরিয়ার যুদ্ধ' পর্যন্ত বলার চেষ্টা করেছিল। এ এক হাস্যকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা! তরুণ বক্তাটিকে এথেন্স নগরীর পত্তন অবধি বলেই বসে পড়তে হয়। এ হল একটা বক্তৃতার মধ্যে অনেক কথা বলার শিকারের উদাহরণ। অবশ্য এটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি রকমের স্বীকার করছি। আমি জীবনে এমন হাজার হাজার বক্তৃতা ব্যর্থ হতে শুনেছি-কারণ তারা অস্পষ্ট বিষয় এক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছে। কেন এরকম ঘটে? এর উত্তর হল মানুষের পক্ষে এক ঘেয়ে ঘটনার কথা শুনে যাওয়া বিরক্তিকর। আপনার বক্তব্য যদি পুরনো দিনপঞ্জি কোন গ্রন্থের মত শোনায় তাহলে কিছুতেই শ্রোতাদের আকর্ষণ করাতে পারবেন না বেশিক্ষণ। শ্রোতাদের মন টেনে রাখতে হলে সহজ বিষয়ের অবতারণা করুন। যেমন, ইয়েলোস্টোন পার্ক ভ্রমণ বিষয়ই ধরা যাক। এর নানা বৈচিত্র্যের বর্ণনা

শ্রোতাদের মুগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট : বক্তা যদি রঙীন বর্ণনায় পার্কটির বন্য জীবজন্তু, উষ্ণ প্রস্রবণ, গাছপালা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি তুলে ধরতে পারেন তা হয়ে উঠবে স্মরণীয়।

এ ব্যাপারটা যে কোন বিষয়ের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তা সে বিক্রীর সম্পর্কেই হোক, কেক তৈরিই হোক বা ব্যালিষ্টিক মিশাইল তৈরি সম্পর্কেই হোক। আপনার বক্তব্য শুরু করার আগেই সীমানা বেঁধে নিতে হবে। আপনার বক্তব্যের বিষয়কে ছোট জায়গায় বেঁধে ফেলে সময়কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন।

ছোট মাপের বক্তৃতায়, ধরুন সময় যেখানে পাঁচ মিনিটেরও কম, সেক্ষেত্রে প্রধান বিষয় নিয়ে শুধু উল্লেখ করাই সম্ভব। ত্রিশ মিনিটের মত দীর্ঘ বক্তৃতাতেও কোন ভাল বক্তা চার কি পাঁচটির বেশি প্রধান উল্লেখ্য বিষয়ের বেশি বলে সাফল্য পান না।

২. সঞ্চয় ক্ষমতা গড়ে তুলুন

ওপর ওপর ভাসা ভাসা কথা বলে বক্তব্য রাখার কাজটা বেশ সহজেই বলা চলে-বরং কঠিন হল গভীরে প্রবেশ করা। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার–যখন ভাসা ভাসা বক্তব্য রাখতে চাইবেন তখনই শ্রোতৃকূলের উপর আপনার প্রভাব পড়বে সামান্য বা একেবারেই না। আপনি যখন আপনার বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে বেশ ছোট কোন সীমানায় বেঁধে রাখতে পারবেন, তখন আপনার পরের পদক্ষেপ হবে আপনার নিজের কিছু প্রশ্ন করা। এই প্রশ্ন আপনি যে বিষয় ঠিক করে রেখেছেন সেটা ভালভাবে বুঝতে আর তৈরি করতে দারুণ

সাহায্য করবে। প্রশ্নটা হল, 'এটা আমি কেন বিশ্বাস করি? বাস্তব জীবনে এর প্রমাণ কখন পেয়েছি? আমি সঠিক কি প্রমাণ করতে চাইছি? এটা ঠিক কিভাবে ঘটেছিল?'

এই ধরনের সব প্রশ্নের যে উত্তর দরকার তা পেলে আপনার মধ্যে সঞ্চয়িত শক্তির প্রকাশ ঘটেবে, যে শক্তি থাকলে লোকে উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে চায়। লুথার বারব্যাঙ্ক, যিনি ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার যাদুকর, তাঁর সম্বন্ধে কথিত আছে মাত্র দুটো সেরা জাতের চারাগাছ হাজির করার জন্য তিনি দশলক্ষ চারাগাছ বাতিল করেছিলেন। কোন বক্তৃতার ব্যাপারেও তাই। বক্তব্য সাজাতে একশ রকম চিন্তা করুন, কিন্তু তার নব্বইটাই বাতিল করা চাই। এর অনেকগুলো বক্তব্য তথ্য হয়তো কাজে লাগবে না, তবুও সেগুলো সংগ্রহ করলে আরও আত্মবিশ্বাস বাড়বে, নিশ্চিত হতে পারবেন। এ হলো নিজেকে তৈরি করার কাজে প্রাথমিক পথ, অথচ বক্তারা একে অবহেলা করেন তা সে জনসংযোগের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই হোক।

আর্থার কান বলেছেন, আমি শয়ে শয়ে সেলসম্যান, ক্যানভাসার আর অন্যান্যদের নাড়াচাড়া করেছি, আর তা করে তাদের বেশির ভাগের মধ্যে যে দুর্বলতা লক্ষ্য করেছি তা হল তাদের সব বিক্রয় যোগ্য জিনিস পত্রের সম্বন্ধে সমস্ত রকম জ্ঞান নেই। বিক্রি শুরু করার আগে যেটা দরকার ছিল। তাদের অনেকেই আমার অফিসে এসে তাদের পণ্যদ্রব্যের এক লাইন বর্ণনা করে সঙ্গে সঙ্গে মাল বিক্রি করতে চেয়েছে। এই বিক্রয় প্রতিনিধিদের কেউ কেউ এক সপ্তাহও টেকেনি আর বেশির ভাগ আটচল্লিশ ঘন্টাও না। আমি ওই সব বিক্রয় প্রতিনিধিদের নানা শিক্ষা দিতে চেয়েছি। আমি তাদের প্রথমেই তাদের পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে সব জানতে বাধ্য করেছি, খাদ্যের প্রোটিন সম্পর্কে জানতে বাধ্য করেছি। নানা ক্লাসে শিক্ষাও তারা নিয়েছে। সেরা বিক্রয় সম্পর্কীয় বক্তৃতার জন্য

পুরস্কারও দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এটাই হল বিক্রয় প্রতিনিধি হওয়ার প্রাথমিক কর্তব্য।

'আমি সব সময় প্রয়োজন ও ব্যবহারের চেয়ে দশ গুণ বেশি খবরাখবর জোগাড় করি; অল্প কিছুকাল আগে কথাটা বলেছিলেন জন গান্থার। জন গান্থার হলেন বিখ্যাত লেখক ভিতর থেকে দেখা' সিরিজের বই লিখে তিনি বিখ্যাত হন। এই বইগুলো বেষ্ট সেলারের মর্যাদা পায় এই বই লেখার কাজের সবরকম খবর তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়।

একবার কোন সময়ে কথাটার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে তিনি এক মানসিক হাসপাতাল নিয়ে ধারাবাহিক কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি এজন্য মানসিক হাসপাতালে গিয়ে অধ্যক্ষের সহকারী আর রোগীদের সঙ্গেও কথা বলেন। আমার এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনি বলেছেন ওই কাজে তাদের অসংখ্যবার বারান্দা পার হয়ে ওপর নিচে ওঠানামা করতে হয়। অফিসে এসে মিঃ গান্থার গাদা গাদা রিপোর্ট, নোট, পরিসংখ্যান ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করেন।

'শেষ পর্যন্ত বন্ধুটি লিখেছিলেন : মিঃ গান্থার চারটি ছোট নিবন্ধ লেখেন, চমৎকার বক্তৃতার পক্ষে এগুলো অপূর্ব। যে কাগজে ওগুলো লেখা হয় তার ওজন ছিল বোধ হয় মাত্র কয়েক আউন্স। অথচ সেটা লিখতে মিঃ গান্থার যেসব কাগজপত্র ঘেঁটেছেন তার ওজন অন্ততঃ বিশ পাউণ্ড।'

মিঃ গান্থার জানতেন তিনি কি কাজ করছেন। তিনি এও জানতেন কোন কিছুই অবহেলা করলে চলবে না। এসব কাজে তিনি প্রাচীন অভিজ্ঞতা সারা মন প্রাণ ওই উদ্দেশ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন।

আমার এক সার্জন বন্ধু আমায় বলেছেন : 'তোমাকে দশ মিনিটেই শিখিয়ে দিতে পারি কি করে উপাঙ্গ বের করে ফেলা যায়। তবে কোন রকম গোলমাল হলে কি করণীয় সেটা শেখাতে আমার চার বছর লেগে যাবে।' বক্তৃতার ব্যাপারেও ওই একই কথা : সব সময় এমনভাবে তৈরি থাকুন যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারেন আপনার জ্ঞান। এমনটা ঘটতে পারে পূর্ববর্তী কোন বক্তার মন্তব্যের ফলে বা আপনার বক্তৃতা শোনার পর কোন শ্রোতার প্রশ্ন।

আপনিও এই সঞ্চিত শক্তি আহরণ করতে পারবেন খুব তাড়াতাড়িই। যেদিন জনগণের সামনে বক্তৃতা করবেন তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শেখার কাজ ছাড়াবেন না। যে কোন সময় আপনার খবর সংগ্রহের কাজ চালাতে পারেন। মনেমনে আবার তা পর্যালোচনাও করে যাওয়া চাই। এর সবচেয়ে ভালো সময় বা অবকাশ হল আপনার অবসর মুহূর্ত–যেমন বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি চালাতে চালাতে, বাসের জন্য অপেক্ষার সময়, পাতাল রেলে চলার ফাঁকে ইত্যাদি। এই রকম মুহূর্তেই আপনার মনে আপনার জানা তথ্য ঝিলিক মেরে যায়। আপনার অবচেতন মন আগে থেকেই আপনাকে তৈরি হতে সাহায্য করে যাবে।

বিখ্যাত বক্তা নর্মান টমাস যিনি তাঁর বিরোধী রাজনৈতিক শ্রোতাদের সশ্রদ্ধ নজর কেড়ে নিতেন, তিনি বলেছেন : কোন বক্তৃতা যদি গুরুত্বপূর্ণ করতে হয় তা হলে বক্তাকে তার

বক্তব্য বিষয় বারবার মনে মনে আলোচনা করে যেতে হবে। তিনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন কিভাবে অবসর সময়ে, কাগজ পড়ার ফাঁকে, রাস্তা চলার সময়, শুতে যাওয়ার সময় তাঁর মন নতুন নতুন নিদর্শনে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সাধারণ স্তরের কোন বক্তৃতার পরিণতি যা তাইই হয়, এটা হলো অসাধারণ চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন আর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ধ্যান ধারণার পরিণতি।

এ ধরনের প্রক্রিয়ায় আপনি যখন নিবিষ্ট থাকেন তখন আপনার মধ্যে জোরালো একটা আকর্ষণ জাগবে প্রতিটি শব্দ এবং বক্তব্যকে একটা কাগজে লিখে ফেলার। কখনও এমন কাজ করবেন না। কারণ এ রকম কিছু করে ফেললেই আপনার সন্তুষ্টি আসবে আর সেটাই আঁকড়ে ধরতে চাইবেন আপনি। এর অবধারিত পরিণতি হবে গঠনমূলক চিন্তাধারা আর কাজ করবে না। এর পরেও একটা আশঙ্কা থেকে যাবে–আর তা হল আপনার বক্তব্য কণ্ঠস্থ করতে চাইবেন আপনি। মার্ক টোয়েন এ ধরনের মুখস্থ করার সম্পর্কে বলেছেন : লিখিত বিষয় বক্তৃতার জন্য নয়, তাদের চরিত্র আর গঠন হল সাহিত্যমূলক। এ হল কঠিন, অনমনীয় আর জিভের আড়ষ্টতা এড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণও সম্ভব হয় না। এর উদ্দেশ্য যদি হয় মনোরঞ্জন শেখানো তাহলে একে ভেঙে সহজ কথ্য ভাষায় এনে কথাবার্তার ভঙ্গীতে বলে যেতে হবে, না হলে তা শুধু শ্রোতাদের বিরক্তিই উদ্রেক করবে–তাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে না।

চার্লস্ এফ. কেটারিং যার আবিষ্কারের প্রতিভায় নির্ভর করেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত জেনারেল মোটরস প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন আমেরিকার একজন আদরের বক্তা। তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয় তিনি তার বক্তব্য লিখে রাখতেন কি না? তিনি জবাব দেন : আমার মনে হয় আমি যা বলতে চাই তা লেখার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি

আমার শ্রোতাদের মনে সাড়া জাগাতে চাই, চাই তাদের আবেগে দাগ রাখতে। একখণ্ড কাগজ আমার আর আমার ইচ্ছার মাঝখানে পথ আটকে থাকতে পারে না।

লিঙ্কন কীভাবে বক্তৃতা তৈরি করতেন

লিঙ্কন কিভাবে তাঁর বক্তৃতা তৈরি করতেন? সৌভাগ্যবশত এটা আমাদের জানা, আর বিগত এক শতাব্দীর চার ভাগের তিন ভাগ ধরে তিনি যেভাবে মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন তা ডীন ব্রাউনের বক্তৃতাতে জানা গেছে। লিঙ্কনের অন্যতম বিখ্যাত বক্তৃতা হল যেটা তিনি ঋষিকল্প হয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন : যে গৃহের অধিবাসীরা নিজেরাই বিভক্ত তা কখনও টিকে থাকতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি অর্ধেক ক্রীতদাস আর অর্ধেক মুক্ত অবস্থায় এ জাতিও টিতে থাকতে পারবে না। আব্রাহাম লিঙ্কন এই বক্তৃতাটি সারাক্ষণ মনে মনে পর্যালোচনা করে চলতেন। খাওয়ার সময়, পথ চলতে চলতে, বাগান পরিচর্যার সময়ও।

কাজ করার ফাঁকে সুযোগ পেলেই লিঙ্কন ছেঁড়া কাগজের টুকরোয়, খামের উপর যেখানেই পেরেছেন নানা ধরনের মন্তব্য লিখে রাখতেন। এর সবগুলো তিনি তাঁর মাথার টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতেন আর অবসর সময়ে সেগুলো ঠিক মত দেখে সাজিয়ে ফেলতেন পরে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে। কোন খুঁটিনাটি তথ্যও তিনি অবহেলা করতেন না।

আপনার আমারও এটা করতে আপত্তি থাকা উচিত না।

৩. আপনার বক্তব্য উদাহরণ দিয়ে সজীব করে তুলুন

রুডলফ ফ্লেমা তাঁর 'আর্ট অফ রিডেবল রাইটিং' গ্রন্থে একটা পরিচ্ছেদ এইভাবে শুরু করেছেন : 'একমাত্র গল্পই পাঠ করার যোগ্য। তিনি এরপর দেখিয়েছেন 'টাইম' আর 'রিডার্স ডাইজেস্ট' সাময়িক পত্র দুটি কিভাবে এই নীতিকে কাজে লাগায়। পত্রিকা দুইটির প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই হয় নিছক বর্ণনা হিসেবে লেখা বা ছোটখাটো ঘটনায় পূর্ণ। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কোন শ্রোতৃবৃন্দের সামনে কথা বলার সময় গল্পের কোন জুড়ি নেই। ঠিক তেমনই নেই কোন পত্রিকায় শেখার ব্যাপারে।

রেডিও আর দূরদর্শনের পর্দায় যাঁর বক্তব্য লক্ষ লক্ষ লোক শুনেছেন সেই নর্মান ভিনসেন্ট পীল বলেন যে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে থাকতেই হবে কিছু উদাহরণ। এই উদাহরণ নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের কাছে একান্ত আকর্ষণীয়। এটা তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

আমার বইয়ের পাঠকরাও বুঝতে পেরেছেন আমার বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি কিভাবে ছোট ছোট কাহিনীর অবতারণা করি। প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ' গ্রন্থটিতে এরকম যে সব উদাহরণ রেখেছি তাতে বইটির তিন-চতুর্থাংশই ভরে গেছে। বাকি এক চতুর্থাংশই মাত্র নিয়মের কথা।

তাহলে আমরা এইরকম বর্ণনামূলক উদাহরণ দেওয়ার কৌশল কিভাবে আয়ত্ত করবো? এটা করার পাঁচটি উপায় আছে। তা হল এই রকম: মানবিকভাব আনা, ব্যক্তিগত কারণ নির্দিষ্টকরণ, নাটকীয়তা আনা, আর দৃষ্টিগোচর করা।

আপনার বক্তব্য মানবিক করুন

আমি প্যারীতে একবার একদল আমেরিকার ব্যবসায়ীকে বলেছিলাম কী করে সফল হওয়া যায় নিয়ে বক্তব্য রাখতে। তাদের বেশিরভাগই কতকগুলো সাধারণ গুণের উল্লেখ করেন আর কঠিন পরিশ্রম, ধৈর্য এবং উচ্চাকাঙক্ষার কথা বলেন।

আমি তখন ক্লাসে কাজ বন্ধ করে এই রকম কিছু বলেছিলাম : আমাদের কোন বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। কেউ সেটা পছন্দ করে না। মনে রাখবেন, আপনাদের মনোরঞ্জন করতে হলে যাই বলুন লোকে কান দেবে না। এ ছাড়াও মনে রাখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয় হল বেশ মনোহারী কাহিনী। অতএব আপনারা আপনাদের পরিচিত দুজন মানুষের গল্প শোনান। আমাদের বলুন তাদের একজন কেন সফল হল আর অন্যজন কেন ব্যর্থ। আমরা এটা মন দিয়ে শুনে আনন্দ পাব আর এমনকি হয়তো তা থেকে লাভবানও হব।

ওই পাঠক্রমে একজন সদস্য ছিলেন যিনি কোন ভাবেই ক্লাসের কাউকে বা নিজেকেও খুশি করতে পারতেন না। আজকের রাতে অবশ্য তিনি মানবিক আগ্রহের ব্যাপারটা শুনে আমাদের তার দুজন কলেজ বন্ধুর গল্প শোনালেন। এক বন্ধু ছিল একটু রক্ষণশীল-সে শহরের নানা দোকান থেকে সার্ট কিনত আর একটা তালিকা তৈরি করে কোন দোকানের সার্ট ভাল তার হিসাব রাখত। নিজের সম্বন্ধে তার এতই উঁচু ধারণা ছিল যে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও সে জীবনে ব্যর্থ হল। তার আশা ছিল বিরাট কোন সুযোগ তার জীবনে আসবে–অথচ সে সুযোগ আর আসেনি। সাধারণভাবেই তাকে জীবন কাটাতে হল।

বক্তা এরপর শোনালেন অন্য বন্ধুর কথা। সে ক্লাসের সকলেরই প্রিয় ছিল। সকলের সঙ্গেই সে মেলামেশা করত। সব সময় তার একটা উচ্চাকাঙক্ষা ছিল। সে সযোগ খুজত। একজন ড্রাফটসম্যান হিসেবে সে জীবন আরম্ভ করে। সেই সময় নিউইয়র্কে বিশ্ব মেলার আয়োজন করা হচ্ছিল। সে জানত ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারে কাজ থাকবে। তাই সে ফিলাডেলফিয়ার চাকরি ছেড়ে নিউইয়র্ক রওনা হল। সেখানে এক বন্ধুর সঙ্গে সে কন্ট্রাকটরের কাজ নিল। টেলিফোন কোম্পানির অনেক কাজ করায় সেই কোম্পানীই মোটা মাইনেয় তাকে কাজে লাগায়।

বক্তার কাহিনী মোটামুটি ভাবেই আমি শোনালাম। সে কাহিনী শোনানোর সময় বেশ সরস কিছু উদাহরণও দেয়। তার কথা বলার সময় ছিল মাত্র দু মিনিট, অথচ কথা শেষ হলে দেখা গেল দশ মিনিট কেটে গেছে। বক্তৃতাটি এতই সুন্দর হয় যে শ্রোতারা তা খুবই উপভোগ করে।

এই ঘটনা থেকে প্রায় সকলেই উপকৃত হতে পারেন। সাধারণ যে কোন বক্তৃতাই লোকের মনে ছাপ ফেলতে পারে তার মধ্যে যদি মানবিক স্পর্শ থাকে। বক্তার দরকার কেবল কথার মধ্যে ছোট খাটো ঘটনার উল্লেখ। এ ধরনের বক্তৃতা কখনও ব্যর্থ হয় না।

অবশ্যই এটা ঠিক যে মানবিক আগ্রহ জাগতে পারে এমন সব কাহিনীর উৎস হল আপনার জীবনেরই অতীত। নিজের সম্বন্ধে বলতে আপত্তি আছে ভেবে কখনই এসব শোনাতে পিছিয়ে যাবেন না। শ্রোতারা কারও নিজের কথা তখনই শুনতে আপত্তি করে যখন তার মধ্যে থাকে অহং ভাব। এ ছাড়া শ্রোতারা সবসময়েই বক্তার জীবনের নানা

ঘটনার কথা শুনতে আগ্রহী হয়। এ হল শ্রোতাকে আকর্ষণ করার নিশ্চিত পথ, এটাকে অবহেলা করবেন না।

নাম উল্লেখ করে বক্তৃতাকে ব্যক্তিগত স্পর্শ দিন

যখন কোন কাহিনী শোনাবেন সব সময় সে কাহিনীর চরিত্রগুলো পরিচয় দেবেন নাম জানিয়ে। 'সে' বা তারা না বলে 'মিঃ ব্রাউন' বা 'মিঃ স্মিথ' বললেও চলবে আসল নাম যদি জানাতে না চান। রুডলফ ফ্লেশ বলেছেন, কোন কাহিনীর বাস্তবতা তখনই সম্পূর্ণ হয় যদি নাম পরিচয় রাখা যায়। এমন কোন কাহিনীর কথা ভাবুন যার নায়কের কোন নাম নেই।

আপনার বক্তব্য যদি নাম আর ব্যক্তিগত পরিচিতিতে পূর্ণ থাকে তাহলে শ্রোতাদের সাগ্রহে শোনার আকাঙক্ষায় সন্দেহ থাকবে না। এটা হয়ে উঠবে আপনার এক অমূল্য বক্তব্য।

আপনার বক্তব্য নির্দিষ্ট আর বর্ণনায় পূর্ণ রাখুন

আপনি এবার হয়তো বলবেন, কথাগুলো ভালই, তবে কিভাবে নিশ্চিত হব আমার বক্তব্য বর্ণনায় পূর্ণ করতে পারব? এ বিষয়ে একটা পরীক্ষা করা যায়। প্রত্যেক রিপোর্টার যেভাবে পাঁচটা প্রশ্ন করে থাকে সেই ভাবেই আপনি এগোতে পারেন। সেই পাঁচটা প্রশ্ন হল এই :

১। কখন? ২। কোথায়? ৩। কি? ৪। কে? ৫। কেন?

এই প্রক্রিয়া যদি অনুসরণ করেন তাহলে আপনার উদাহরণগুলো সজীব হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে আমার নিজের একটা কাহিনী শোনাচ্ছি। এটা রিডার্স ডাইজেস্টে ছাপা হয় :

কলেজ ছাড়বার পর আমি দুবছর আরমাউর অ্যাণ্ড কোম্পানির হয়ে দক্ষিণ ডাকোটায় বিক্রয় প্রতিনিধি হয়ে ভ্রমণ করি। আমি আমার এলাকায় ঘোরার সময় মাল গাড়িতে ভ্রমণ করেছিলাম। একদিন রেডফিল্ডে দক্ষিণের ট্রেন ধরার জন্য পড়ে থাকতে হয়। রেডফিল্ড আমার বিক্রয় এলাকা ছিল না তাই এজন্য কোন সময় রাখিনি। এক বছরের মধ্যে আমি আমেরিকান নাটক অ্যাকাডেমীতে পড়তে যাব। তাই ঠিক করলাম ট্রেন না আসা পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে ম্যাকবেথের নাটক থেকে মহড়া দিতে শুরু করবো। হাত বাড়িয়ে নাটকীয় ভাবে আমি শুরু করলাম : 'আমার সামনে যা দেখতে পাচ্ছি তা কি একটা ছোরা? এস, তোমাকে ধরতে দাও : তোমাকে স্পর্শ করিনি, তবুও তোমাকে নিরীক্ষণ করছি।'

আমি আপন মনে তখনও মহড়া দিয়ে চলেছিলাম, আর তখনই চারজন পুলিশ আমাকে ঘিরে ধরল। তারা জানতে চাইল আমি মেয়েদের ভয় দেখাচ্ছি কেন? কথাটা শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত, ওরা যদি বলত আমি ট্রেনে ডাকাতি করছি তাহলেও অতটা আশ্চর্য হতাম না। তারা আমায় জানাল একশ গজ দূর থেকে একজন গৃহকর্ত্রী আমাকে লক্ষ্য করে পুলিশে খবর দেন। এরকম কাণ্ড তিনি আগে কখনও দেখেন নি। আমি ছোরার কথা বলছিলাম বলে এই ব্যাপার হল।

'আমি পুলিশদের জানালাম আমি শেক্সপীয়ারের কবিতা আবৃত্তি করছি। আমাকে আমার কোম্পানীর কার্ড দেখাতে হল। তবেই ছাড়া পেলাম।'

এবার দেখুন, ওই পাঁচটি প্রশ্ন কেমন কাজ করছে। অবশ্য অতিরিক্ত বর্ণনা আবার খারাপ : আমরা সকলেই বেশি বাড়াবাড়ি রং ঢং পছন্দ করি না।

কথপোকথন সহ আপনার বক্তব্য নাটকীয় করুন

ধরুন, আপনি কিভাবে একজন ক্রুদ্ধ ক্রেতাকে ঠাণ্ডা করার জন্য মানবিক সম্পর্কের কোন দিক কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা বর্ণনা করতে চান। তাহলে এইভাবে শুরু করতে পারেন।

'একদিন আমার অফিসে একজন এসেছিলেন। তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত, কারণ গত সপ্তাহে আমরা তাকে যে যন্ত্রটা পাঠাই সেটা কাজ করছিল না। আমি তাঁকে জানালাম এ সম্পর্কে যা করণীয় সবাই আমরা করব। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক খানিকটা ঠাণ্ডা হলেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন আমরা সত্যিই সাহায্য করতে ইচ্ছুক।' এই সত্য কাহিনীর একটা গুণ আছে। এটা বেশ নির্দিষ্ট, তবে এতে কোন নাম, বর্ণনা আর সবার উপর কোন নির্দিষ্ট কথপোকথন নেই যেটা থাকলে এটি সজীব হতে পারত। সে রকম হলে কি দাঁড়াত এবার দেখা যাক :

'গত সপ্তাহে আমার অফিস ঘরের দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল, মুখ তুলতেই আমাদের পরিচিত ক্রেতা চার্লস্ ব্লেক্সামের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখতে পেলাম। তাকে বসতে বলার আগেই

তিনি বলে উঠলেন, এড, এই শেষবার। এখনই একটা ট্রাক পাঠিয়ে আমার বাড়ি থেকে কাপড় কাঁচার মেশিনটা আনবার ব্যবস্থা কর।‘

‘আমি তাকে প্রশ্ন করলাম ব্যাপারটা কী? তিনি বললেন, যন্ত্রটা কাজ করছে না। সব কাপড় জামা জড়িয়ে যাচ্ছে, আমার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে গেছে।’

‘আমি তাঁকে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে বললাম। তিনি চিৎকার করে বললেন; আমার সময় নেই অফিসের দেরী হয়ে যাবে। জিনিসটা এখান থেকে কেনাই উচিত হয়নি। তিনি টেবিলে এমন ঘুসি মারলেন যে আমার স্ত্রীর ছবিটা উল্টে পড়ল।

‘দেখ, চার্লি’ আমি বললাম, ‘সব কথা যদি বুঝিয়ে বল তাহলে যা বলবে তাই করব।’ এ কথায় চার্লি শান্তভাবে সব জানাতে ব্যাপারটা সমাধান হয়ে গেল।

আপনার পক্ষে হয়তো সব সময় কথার মধ্যে কথপোকথন ঢোকানো সম্ভব নাও হতে পারে। তবে উপরের লেখা থেকে এটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন বক্তব্য কতখানি নাটকীয় হতে পারে। বক্তার যদি নকল করার ক্ষমতা থাকে তাহলে তো কথাই নেই, আরও সজীব হতে পারে বক্তব্য। এই ধরনের বক্তব্য বেশ বিশ্বাসযোগ্যও হয়ে ওঠে।

যা বলেছেন তাকে ছবিতে জীবন্ত ফুটিয়ে তুলুন

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন আমাদের জ্ঞানের শতকরা পঁচাশি ভাগই আসে দর্শন থেকে। এই কারণেই মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসেবে দূরদর্শনের এত সাফল্য, বিজ্ঞাপন হিসেবেও তাই। জনসংযোগের ব্যাপারেও দর্শন আর শ্রবণের মূল্য অনেকখানি! আশ্চর্যের কথা প্রচুর

বক্তাই এটাকে ঠিক অনুসরণ করেন না। গড় পড়তা বক্তাই দর্শনের মূল্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। এটা নেহাতই ভুল। আমি এখানে বলতে চাই বক্তব্যের মাঝখানে ছবি সৃষ্টি করার কথা। সেই বক্তার কথাই শ্রোতারা মন দিয়ে শুনে থাকেন যিনি ছবি তৈরী করে হাজির করতে পারেন।

ছবি। ছবি। ছবি। যে বাতাসে শ্বাস টানছেন এগুলো তার মতই মুক্ত। আপনার কথার মাঝখানে তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। ছবির মাধ্যমে আপনার বক্তব্য জীবন্ত করে তুলুন।

বাইবেল আর শেকসপীয়ারের রচনাই পাতায় পাতায় ছবির মত এই কথা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : যে কোন সাধারণ লেখক বলবেন বিশেষ কোন জিনিস 'অপ্রয়োজনীয়'–এ যেন শ্রেষ্ঠকে আরও ভাল করার চেষ্টা। শেকস্পিয়ার কীভাবে লিখেছেন? একটা আলেখ্য তিনি তৈরী করে অমরত্ব লাভ করেছেন : মসৃণ স্বর্ণকে মসৃণতা দেয়া, পদ্মফুলকে সুন্দর করা আর রজনী গন্ধার সুগন্ধি ঢালা ...।'

কোনদিন কি ভেবে দেখেছেন যুগ যুগান্ত পার হয়ে যে সব প্রবাদ চালু রয়েছে তার সবই জীবন্ত ছবির মত? 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো', 'অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জল পান করালে খায় না ইত্যাদি।

আব্রাহাম লিঙ্কন অধিকাংশ সময়েই এই ধরনের সচিত্র কথপোকথনের অবতারণা করতেন। যখনই তিনি কোন দীর্ঘ, জটিল রিপোর্ট হোয়াইট হাউসে তাঁর ডেস্কের উপর পেতেন তখন সেগুলো সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ করতেন। এগুলো কোন সময়েই আবার

নীরস বাক্যবিন্যাসে নিবদ্ধ থাকত না। বরং এমন চমকার ছবির মত শব্দ ব্যবহার করতেন যা প্রায় ভোলা অসম্ভব। তিনি যেমন বলেছেন : কোন ঘোড়ার সম্পর্কে জানার সময় ঘোড়ার ল্যাজে কটা চুল আছে আমি জানতে চাই না, বরং জানতে চাই ওর গুণ কি রকম।'

আপনার দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট আবেদন ফুটিয়ে তুলুন। মনে মনে ছবি এঁকে নিয়ে তাকে প্রকাশ করুন। এ ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে–যেমন ধরুন কখনও কোন কুকুরের উল্লেখ করলে তাকে বোঝানোর জন্য আরও ব্যাখ্যার দরকার। যেমন যদি বলা যায় পানিয়েল' 'স্কটিশ টেরিয়ার' বা 'ফেট কর্নার্ড' তাহলে নির্দিষ্ট জাতের কুকুরের একটা ছবিই শ্রোতারা চোখে ফুটে ওঠে। আরও পরিষ্কার আর

পরিস্ফুট করা যায় যদি কোন 'ঘোড়ার' উল্লেখ করার বদলে বলা যায় কালো টাটু ঘোড়া।

উইলিয়াম ট্রাঙ্ক, ছোট, তার 'এলিমেন্টস অব স্টাইল' প্রবন্ধে বলেছেন : যারা লেখার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা অন্ততঃ একটা বিষয়ে একমত হন। সেটা এই : পাঠকের নজর কেড়ে নেওয়ার নিশ্চিত পথ হল নির্দিষ্ট সঠিক আর উপযুক্ত হতে হবে। হোমার, দান্তে, শেকস্পীয়ারের মত মহান লেখকরা অমরত্ব লাভ করেন বিশেষ করে তাঁদের রচনায় নির্দিষ্ট এবং সঠিক বর্ণনা করেছেন বলেই। তাঁদের প্রতিটি বাক্যই ছবির মত দৃশ্যমান। লেখার বেলায় এটা নিছক সত্যি।

বেশ ক'বছর আগে কার্যকর বক্তৃতা সম্পর্কে একটা পাঠক্রমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করি, আমরা ঠিক করে দিই প্রত্যেক বক্তাকে হয় কোন ঘটনা বা ব্যক্তি বা তারিখ সম্বন্ধে

উল্লেখ করতে হবে। এর ফল হয়েছিল একেবারে বৈপ্লবিক। ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফরাসী দার্শনিক আঁলে বলেছেন, কোন বিমূর্ত ভাব সব সময়েই খারাপ। আপনার বাক্যকে সর্বদাই মানুষ, আসবাবপত্র, প্রাণীতে পূর্ণ রাখা চাই।

প্রাত্যহিক কথাবার্তাতেও এটা সত্য? আসলে এ বইয়ে যা এখন পর্যন্ত বলেছি তার প্রত্যেকটি অংশই প্রাত্যহিক কথপোকথনের ক্ষেত্রে দরকার। বর্ণনা থাকলেই বক্তব্য প্রস্ফুটিত হয়। যে কোন লোকই হোক, সে যদি কার্যকর বক্তা হতে চায় তাকে এ বইয়ের পরামর্শ মেনে চলতে হবে; তারপর সুযোগ মত তা কাজেও লাগাতে হবে। যারা দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন, গৃহকর্ত্রীর আর শিক্ষকরা দেখতে পাবেন শিক্ষাদান করার সময় এই পদ্ধতি কাজে লাগালে কতটা ফলপ্রসূ হওয়া যায়।

অতএব সঞ্চয়ী জ্ঞান লাভ করতে আপনাকে যত বেশি সম্ভব জ্ঞানও অর্জন করতে হবে আর তাকে কাজেও লাগাতে হবে।

.

০৫. বক্তব্য প্রাণবন্ত করে তোলা

প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরে আমি লন্ডনে থেকে লাওয়েল টমাসের সঙ্গে কাজ করছিলাম। লাওয়েল টমাস, 'অ্যালেনবী' আর 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' সম্বন্ধে চমৎকার কিছু বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সভায় সে সময় তিল ধারণের জায়গা থাকত না। এক রবিবার আমি হাইড

পার্কে মার্বেল আর্চের কাছে হাজির হলাম। সেখানে নানা মতবাদের মানুষ নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বর্ণ, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা জাতের বক্তার সেখানে আইনরক্ষকদের বাধা ছাড়াই বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা ছিল। এক মুহূর্তে আমি শুনলাম একজন ক্যাথলিক বোঝাচ্ছেন পোপই সর্বশ্রেষ্ঠ। তার কখনও ভুল হয় না। সেখান থেকে সরে গেলাম আর এক মঞ্চে-সেখানে একজন সমাজতন্ত্র আর কার্ল মার্কসের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। এবার তৃতীয় এক বক্তার সামনে শ্রোতাদের মধ্যে দাঁড়ালাম। সেখানে বক্তা বোঝাচ্ছেন চারটি স্ত্রী রাখার যৌক্তিকতা কি। এরপর সরে এসে তিনটি দলের দিকেই তাকালাম।

ব্যাপারটা কি বিশ্বাস করবেন? যে লোকটি চারটি স্ত্রী রাখার সুবিধার কথা বলছিল তার শ্রোতার সংখ্যা সবচেয়ে কম মাত্র কয়েক জনই। অথচ বাকি দুজন বক্তার শ্রোতার সংখ্যা প্রচুর, আর ক্রমশঃ বাড়ছিল। নিজেকে প্রশ্ন করতে চাইলাম এর কারণ কি? বিষয় বস্তু আলাদা হওয়ার জন্য? তা কিন্তু মনে হোলনা.। এরপর বক্তাদের ভাল করে লক্ষ্য করেই এর ব্যাখ্যা মিলে গেল। তাদের মধ্যেই এর উত্তর ছিল। যে লোকটি চারটি স্ত্রী রাখার কথা বলছিল সে নিজেই বোধহয় চার স্ত্রী রাখতে আগ্রহী নয় বলেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু বাকি দুজন বক্তা সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়ে একান্তভাবেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা সজীব আর জীবন্ত ভঙ্গীতে কথা বলছিলেন। মাঝে মাঝেই তাঁদের হাত নড়ছিল। তাঁদের কণ্ঠস্বর দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিল। তাঁদের মধ্যে থেকে যেন আগ্রহ আর সজীবতা বিচ্ছুরিত হতে চাইছিল।

সজীবতা, প্রাণশক্তি, আগ্রহ-এই তিনটিকেই চিরকাল আমি একজন বক্তার একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ বলেই ভেবেছি। প্রাণশক্তিতে ভরপুর বক্তার কাছেই ভিড় করে শ্রোতারা।

কিন্তু প্রাণশক্তিময় বক্তৃতা করার ক্ষমতা কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব? এই পরিচ্ছেদে আপনাদের বক্তৃতাকে কীভাবে এই রকম আগ্রহী আর উত্তেজনাময় সজীবতায় জুড়ে দিতে পারবেন সে কথাই বলব।

১. যাতে ঐকান্তিক আগ্রহ আছে তেমন বিষয়ই ঠিক করে নিন

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে আপনার বক্তব্য বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া কতখানি দরকারী। আপনি যদি আপনার বক্তব্য সম্বন্ধে আবেগে জড়িত না হন তাহলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না শ্রোতারা তাতে আদৌ আগ্রহী হবে। এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যে বিষয়ে আপনার খুবই ঐকান্তিকতা আছে তেমন কোন বিষয় বেছে নিলে। যেমন আপনার অবসর বিনোদনের উপায় বা শখ ইত্যাদি যাতে আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাহলে দেখবেন শ্রোতাদের আগ্রহ জাগাতে আপনার কণামাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

ঐকান্তিকতা যে একজন বক্তার কতখানি শক্তি, সেটার প্রমাণ পেয়েছিলাম নিউ ইয়র্কে আমার এক ক্লাসে। আমি ব্যাপারটা নাম দিয়েছি 'সবুজ ঘাস বনাম কাঠের ছাই' এর মামলা।

শহরের এক নামজাদা প্রতিষ্ঠানের একজন বিখ্যাত সেলসম্যান বা বিক্রয় প্রতিনিধি যাচ্ছেতাই একটা বক্তব্য পেশ করেন যে, শিকড় বীজ ছাড়াই তিনি সবুজ ঘাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জানালেন শুকনো ছাই গাদার মধ্যে তিনি ঘাস ফুটিয়েছেন। তার বক্তব্য হল ছাই থেকেই ওই ঘাস জন্মেছিল।

ভদ্রলোকের কথা শোনার পর আমি বেশ নম্রভাবেই তাকে বললাম, তিনি যে আবিষ্কার করেছেন তাতে তিনি লক্ষপতি হয়ে যাবেন। তাকে আরও বললাম তার আবিষ্কার তাঁকে বিশ্বের একজন নামী বিজ্ঞানীর সম্মানও এনে দেবে। তাঁকে এও বললাম আজ অবধি কোন মানুষ ছাইগাদা থেকে ঘাস জন্মাতে পারে ভাবেনি কারণ সবাই জানে জড় পদার্থ থেকে জীবন সৃষ্টি হতে পারে না।

আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোকের ভুলটা এতই অসম্ভব যে তিনি অবশ্যই তা বিশ্বাস করবেন। আমার কথা শেষ হতেই শ্রোতাদেরও দেখলাম ভদ্রলোকের কথার অসারতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। কিন্তু লোকটি নিজের ভুল আদৌ উপলব্ধি করতে পারলেন না তিনি আমার কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, তিনি যা বলছেন তা ভেবেচিন্তেই বলছেন। তিনি আবার তার আগের কথার জের টেনে জানালেন, ছাইগাদা থেকে ঘাস জন্মাতে দেখেছেন। কথাটা এবার বেশ ঐকান্তিকতা আর জোর মিশিয়েই বললেন তিনি।

আমি আবার তার কথায় আপত্তি জানালাম। এও তাকে বললাম, আসল সত্যের হাজার মাইলের মধ্যেও তিনি আসেন নি। তিনি এবার লাফিয়ে উঠে বললেন, তিনি পাঁচ ডলার বাজি রাখতে রাজি আছেন। ব্যাপারটা আমেরিকার কৃষি দপ্তরে লেখা যেতে পারে মতামতের জন্য।

এবার কি ঘটল জানেন? শ্রোতাদের মধ্যে বেশ অনেকেই তাঁর লক্ষ সমর্থন করতে লাগল। আবার অনেকেই তার বিরুদ্ধে গেল। যদি তখন ভোট নিতাম তাহলে দেখতাম অর্ধেকেরও বেশিই তাঁর দিকে চলে গেছে। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম তাদের

মত বদলাবার কারণ কি? একের পর এক শ্রোতা জানাল বক্তার ঐকান্তিকতা আর বিশ্বাসই তাঁদের মতো পরিবর্তনে বাধ্য করেছে আর সেইজন্য তাদের সাধারণ বুদ্ধি কাজ করেনি।

যাই হোক ওই রকম একটা অবস্থায় পড়ে বিষয়টা নিয়ে আমি কৃষি দপ্তরে চিঠি লিখলাম। তাদের লিখলাম ব্যাপারটা এতই বোকার মত যে আমি লজ্জিত। তার জবাবে তারা জানাল ব্যাপারটা অবাস্তব ও অসম্ভবছাইগাদা থেকে ঘাস কখনই জন্মায় না। তারা আরও জানাল আর একটা চিঠিও তারা এ বিষয়ে পেয়েছেন। সেই বিক্রয়-প্রতিনিধি নিজের মতে এতই অবিচল ছিলেন যে তিনিই চিঠি লেখেন।

ওই ঘটনাটা আমাকে যে শিক্ষা দেয় জীবনে সেটা ভুলতে পারিনি। কোন বক্তা যদি ঐকান্তিক হয়ে কিছু বিশ্বাস করে আর সেই আগ্রহ নিয়ে তা বলে তাহলে তার কথায় আস্থা স্থাপন করার লোকের অভাব হয় না।

আর তা ছাই থেকে ঘাস জন্মানো হলেও।

অধিকাংশ বক্তাই মাঝে মাঝে ভাবনায় পড়ে যান যে তাদের বক্তব্য বিষয় শ্রোতাদের গ্রহণযোগ্য হবে কি না। শ্রোতাদের আগ্রহী করার একটা পথই আছে : আপনার বক্তব্য সম্পর্কে ঐকান্তিক হয়ে ওঠে আর আবেগ প্রকাশ করা।

ইতালিতে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড পয়াসবার্ন চাইল্ডকে একবার প্রশ্ন করা হয় লেখক হিসাবে তার সফলতার কারণ কি? তিনি জবাব দেন : 'জীবন সম্পর্কে আমার

এমনই উত্তেজনা জাগে যে স্থির থাকতে পারি না। মানুষকে সে কথা আমায় জানাতেই হয়।' কোন বক্তা বা লেখকের ব্যাপারও তাই-শ্রোতা বা পাঠক উদ্বেল না যে পারে না।

একজনের কথা এবার বলছি। ওয়াশিংটনে আমাদের পাঠক্রমে ক্লাসে মিঃ ফ্লিন নামে একজন আসেন। এক সন্ধ্যায় তিনি ক্লাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী শহর সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি আসলে যা শোনাচ্ছিলেন তা স্থানীয় কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বর্ণনা থেকে ধার করা মাত্র। তাই তাঁর বক্তৃতা নেহাতই নীরস লাগছিল শ্রোতাদের। যদিও তিনি চিরকাল ওয়াশিংটনে থেকে এসেছেন তা সত্বেও একবারও বললেন না শহরটি তাঁর ভালো লাগার কারণ কী? তিনি নিছক, নীরস কতকগুলো বর্ণনা দিয়ে গেলেন।

এক পক্ষকাল পর এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যে মি. ফ্লিন একদম হৃদয়ে নাড়া খেলেন। তাঁর নতুন গাড়িখানা রাস্তায় দাঁড় করানো ছিল। অন্য একখানা গাড়ি তার গাড়িকে ধাক্কা মেরে ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। এর ফলে মি. ফ্লিনের পক্ষে কোনভাবেই বীমার টাকা আদায় করার উপায় ছিল না। এ বিষয়ে বলতে মি. ফ্লিন প্রায় ভিসুভিয়াসের মত টগবগ করছিলেন। যে ক্লাসের শ্রোতারা তার আগের কথায় কান দেয়নি তারাই আজ তাঁর কথায় দারুণ আগ্রহ দেখাল। তারা হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাতে লাগলেন।

এই কারণেই আমি বারবার বলতে চেয়েছি সঠিক বিষয় বেছে নিয়ে বক্তব্য রাখতে পারলে আপনি কখনই ব্যর্থ হবেন না। বক্তব্যের একটা অংশ আপনাকে জয় এনে দেবেই। তাহল যে বিষয়ে আপনার ঐকান্তিকতা আছে সেটাই বলা। এই বিষয় খুঁজে পেতে আপনাকে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে না–এটা ভাসমান অবস্থায় আপনার

চেতনার উপরে নির্ভর করে। এর কারণও পরিষ্কার–আপনি প্রায়ই এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করেন।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, প্রাণদণ্ড সম্পর্কে একটা পরিষদীয় বিল নিয়ে টেলিভিশনে মতামত বিনিময় করা হয়। বহু সাক্ষীকে তাদের মতামত জানানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়-পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দিতে। এদের একজন ছিলেন লস এঞ্জেলেসের পুলিশ দপ্তরের কর্মী। যিনি বিষয়টা নিয়ে প্রচুর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। প্রাণদণ্ডের প্রতি তার প্রচণ্ড দাবী ছিল কারণ তাঁর এগারো জন সহকর্মী অপরাধীদের সঙ্গে বন্দুকের লড়াইতে মারা যায়। তিনি এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যাতে বোঝা গেল এ ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিকতা কতটা। ইতিহাসে যে কোন আবেদনই এই ঐকান্তিকতায় নির্ভর করে এগিয়েছে। যে কোন সৎ প্রচেষ্টা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল আর বিশ্বাসের অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ে। হৃদয়ের যুক্তি আছে যে যুক্তি তা জানে না।' কথাটা পাসকালের, আর এটা আমার ক্লাসে যাচাই করে দেখেছি। আমার বোস্টনের জনৈক আইনজ্ঞের কথা মনে পড়ছে যিনি বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা করতেন। তাঁর চেহারাও ছিল চমৎকার অথচ তিনি বক্তৃতা শেষ করবার পর শ্রোতারা বলে উঠলেন : বেশ চালাক মানুষ। এর কারণ হল তিনি যে ছাপ রাখতেন তা ওপর ওপর ভেসে থাকত। তার বক্তৃতায় কোন হৃদয়ের অনুভুতি মেশানো থাকত না–শুধু চটকদার কিছু কথার ফুলঝুরি। ওই একই ক্লাসে আবার ছিলেন একজন বীমার বিক্রয় প্রতিনিধি। ছোট খাটো চেহারা, খুব দাগ কাটে না মনে। অথচ তিনি যখন কথা বলেন শ্রোতারা তাঁর প্রতিটি কথাই মন দিয়ে শুনতে চায়।

ওয়াশিংটনের এক নাট্যশালায় আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় এক বছর কেটে গেছে অথচ তার জীবনে নীতিবোধ আর তাঁর কথা আজও আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে

আছে। আইন সম্পর্কে তাঁর চেয়েও অভিজ্ঞ মানুষ হয়তো ছিলেন তা সত্ত্বেও যে একনিষ্ঠতা আর সততা নিয়ে তিনি গেটিসবার্গে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তা কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।

একবার, আপনারা যেমন বলেন সেইভাবে একজন বলেছিলেন, তাঁর কোন বিষয়েই তেমন আগ্রহ জাগে না। আমি তাকে বলেছিলাম যে-কোনো একটা বিষয়ে আগ্রহী হতে! যেমন, একটা উদাহরণ দিন তো? ভদ্রলোক একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করেছিলেন। আমি উত্তর দিই, ধরুন পায়রা?' ভদ্রলোক আরও অবাক। হ্যাঁ, পায়রা', আমি উত্তর দিয়েছিলাম। বাইরে গিয়ে পায়রার ঝাঁক কোথাও পেলে তাদের খাওয়ান। লাইব্রেরীতে তাদের সম্বন্ধে বই পড়ে নিন তারপর এখানে এসে সে কথা শোনান। লোকটি তাই করেছিল। সে এসে যখন পায়রা নিয়ে কথা আরম্ভ করল তাকে বাধা দেওয়াই কঠিন হয়ে উঠল। অদ্ভুত দক্ষতায় আর আবেগে সে যে বক্তব্য রাখল এমন চমৎকার বক্তৃতা আর শুনিনি।

আর একটা পরামর্শ রাখছি : যতটা পারেন আপনার জানা আর প্রিয় বিষয়ে শিখুন এবং এটা করলেই দেখতে পাবেন আপনি কতখানি আবেগ আর সজীবতা লাভ করেছেন। বিক্রয়ের পাঁচটি বিখ্যাত নিয়ম বইয়ের লেখক পার্সি এইচ হুইটিঙ বিক্রয় প্রতিনিধিদের তার ওই বইয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তাদের পণ্য সম্পর্কে জানার কাজে কখনই অবহেলা না করতে। মিঃ হুইটিঙ বলেছেন, কোন ভাল পণ্য সম্পর্কে যত জানবেন, ততই আপনি আগ্রহী হবেন। অন্যান্য সব বিষয় সম্পর্কেও একই কথা-সেগুলো সম্বন্ধে আপনি যতই জানবেন ততই আপনার উৎসাহ বাড়বে।

২. নিজের বক্তব্যের অনুভূতিকে জীবন্ত করে তুলুন

ধরুন আপনি শ্রোতাদের সামনে শোনাচ্ছেন, নির্ধারিত গতিবেগের এক মাইল বেশি গতিতে চালানোর ফলে একজন পুলিশ আপনাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ঘটনাটা আপনি বেশ শীতলভাবেই তৃতীয় ব্যক্তিকে শোনাতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা আপনার জীবনেই ঘটেছে আর সে সময় আপনার কিছু অনুভূতিও জন্মায়। তৃতীয় ব্যক্তিকে বর্ণনা শ্রোতাদের তেমন মনোরঞ্জন করতে পারে না। অতএব ঘটনাটা যে ভাবে আপনার জীবনে ঘটেছে ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করলে, তাকে জীবন্ত করে তুললে তা ঢের বেশি হৃদয়গ্রাহী হবে।

আমরা যে নাটক বা সিনেমা দেখতে যাই তার কারণ হল আমরা আবেগের প্রকাশ দেখতে আগ্রহ বোধ করি। আমরা নিজেদের আবেগ সকলের সামনে প্রকাশ করে এতই ভয় পাই যে নাটক বা ছবি দেখে আমাদের সেই আকাঙক্ষা দমন করি।

আপনি যখন জনসংযোগ করেন তখন আপনাকে আপনার বক্তব্যের মধ্যে আনুপাতিক হারে উত্তেজনা আর আবেগের মিশেল দিতে হবে। আপনার সৎ আবেগকে গলা টিপে ধরবেন না। বরং আপনার শ্রোতাদের সামনে প্রমাণ রাখুন কতখানি আগ্রহ আপনার বক্তব্য সম্পর্কে রয়েছে।

৩. আন্তরিকতা প্রকাশ করুন

আপনি যখন পায়ে পায়ে শ্রোতাদের সামনে কথা বলার জন্য এগিয়ে যান তখন কোন কিছু ঘটবে এ আশা করে এগোতে চাইবেন না। কখনই এমন ভাব দেখাবেন না যেন

ফাঁসি কাঠের দিকে এগোচ্ছেন। আপনার চলার ছন্দে হয়তো কৃত্রিমতা থাকতে পারে। তবুও তা চমক সৃষ্টি করতে পারে। এতে শ্রোতাদের ধারণা জন্মাবে কোন বিষয় শোনাবার নিদারুণ আগ্রহ আপনারও রয়েছে। এরপর শুরু করার ঠিক আগে বেশ গভীর একটা শ্বাস টানুন। কোন রকম আসবাব বা চেয়ার এড়িয়ে চলুন। মাথা উঁচু আর চিবুক তুলে এগোন। আপনি একটু পরেই আপনার শ্রোতাদের প্রয়োজনীয় কিছু শোনাতে চলেছেন–তাই তাদের আপনার বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে শোনাবেন। এখন আপনিই রাজা। এই রকমই বলেছিলেন একদিন উইলিয়াম জেমস।

এই ভঙ্গীকে বলা যেতে পারে শরীর গরম করা। এটা যে কোন অবস্থাতেই করা চলে। ডোনাল্ড এবং এলিনর লেয়ার্ড তাদের টেকনিকস ফর এফিসিয়েন্ট রিমেমবারিং'-এ বলেছেন, প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট এ ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন আগ্রহ আর ঐকান্তিকতার মূর্ত প্রতীক। উইলিয়াম জেমসের দর্শন অনুযায়ী টেডি রুজভেল্টকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর তা হল : 'আন্তরিক হোন আর তাহলেই আপনি যা করবেন তাতেই আন্তরিকতা অর্জন করতে পারবেন।'

৫. শ্রোতাদের সঙ্গে বক্তব্য আদান প্রদান করুন

রাসেল কনওয়েলের বিখ্যাত বক্তৃতা 'একরেস অব ডায়মন্ডস্' প্রায় হাজার বার দেওয়া হয়। আপনি হয়তো ভাবছেন এতবার দেওয়ার ফলে বক্তৃতার প্রতিশব্দ প্রতিটা কথাই বক্তার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা অবশ্য তা হয়নি। ড. কনওয়েল জানতেন শ্রোতারা সাধারণত নানা ধরনের হয়। তাই ডঃ কনওয়েল সিদ্ধান্তে আসেন শ্রোতাদের বোঝাতে হবে এ বক্তৃতা কেবল তাদের জন্যই করা হচ্ছে। তাহলে তিনি কিভাবে পরের বার বক্তা, বক্তৃতা আর শ্রোতাদের মধ্যে পারস্পরির সম্পর্ক বজায় রাখেন? ডঃ কনওয়েল এ সম্বন্ধে লিখেছেন : 'কোন শহরে যখন কথা বলার আমন্ত্রণ পাই, সেখানে বেশ আগেই হাজির হই। তারপর প্রথমে যাই সেখানকার পোষ্টামাষ্টার, ক্ষৌরকার, হোটেল ম্যানেজার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কোন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। এরপর যাই কোন দোকানে আর লোকজনের সঙ্গে কথাও বলি। আমি জানতে চেষ্টা করি ওখানকার ইতিহাস, কি কি সুযোগ তাদের শহরে আছে, এই সব। তারপর ওখানকার শ্রোতাদের সামনে তাদের পছন্দসই স্থানীয় বিষয়ে বক্তৃতা দিই।'

ডঃ কনওয়েল ভালই জানতেন সফল আদান-প্রদান নির্ভর করে বক্তা কিভাবে শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দিলে তারাও তাতে অংশ গ্রহণ করবে। আর এই কারণেই আমাদের কাছে একরেস অব ডায়মণ্ডের' আসল কোন কপি নেই। ব্যাপারটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। মানব চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ হওয়ায় ডঃ কনওয়েল কখনই এক বক্তৃতা দুবার দেননি–অথচ তিনি একই বিষয় নিয়ে অন্তত ছ' হাজার বার আলাদা শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা দেন। বিশেষ ধরনের শ্রোতাদের কথা মনে রেখে আপনার

বক্তব্য তৈরী করে শোনাতে এই অভিজ্ঞতাকে আপনিও কাজে লাগাতে পারেন। নিচে আপনার সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোরার কতকগুলো সহজ নিয়ম উল্লেখ করছি।

১. শ্রোতাদের পছন্দ বিষয়ে বক্তব্য রাখুন

ডঃ কনওয়েলও ঠিক তাই করতেন। তিনি তার বক্তব্যে মিশিয়ে দিতেন স্থানীয় বহু আগ্রহের বিষয়। তাঁর শ্রোতারা খুব আগ্রহ বোধ করতেন কারণ তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের পছন্দসই বিষয়ে ভরপুর থাকতো। শ্রোতাদের সঙ্গে বক্তার এই যে একাত্মতা এটাই বক্তার জনপ্রিয়তা আনতে পারে। আমেরিকার চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আর পরবর্তীকালে মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এরিক জনস্টন যত বক্তৃতা দেন তার সব কটিতেই এই কৌশল প্রয়োগ করেন। ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি কিভাবে স্থানীয় জনগণের আগ্রহের বিষয় কাজে লাগিয়েছিলেন দেখুন:

......ওকলাহোমা একদিন হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল, তাকে প্রায় বাতিলের পর্যায়েই ফেলতে চাওয়া হয়েছিল।

১৯৩০ সালে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে উড়ন্ত দাঁড়কাকের দলও ওকলাহোমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। ওকলাহোমাকে আমেরিকার দিগন্ত প্রসারী মরুভূমির অংশ বলেই প্রচার হতে থাকে...। সবাই বলতে থাকে এখানে আর কোনদিনই সবুজের ছোঁয়া লাগবে না।

কিন্তু ১৯৪০ সালে ওকলাহোমাই হয়ে ওঠে এক সুন্দর বাগান–আবার ক্ষেতের বুকে বাতাসে দোলে গমের শিষ, বাতাস বয়ে আনে আগামী বর্ষণের ইশারা।

...এখানে খুঁজে পেয়েছি আশার আলো। ওকলাহোমার ভবিষ্যৎ। এখানে শুধুই ভবিষ্যৎ আশাভরা জীবনের প্রতিশ্রুতি।

শ্রোতাদের মনের মত বক্তৃতার এমন চমৎকার নিদর্শন আর নেই। এরিক জনস্টন শ্রোতাদের জীবনের অতীত ঘটনাবলি থেকেই তার বক্তৃতার রসদ জোগাড় করেছিলেন। তিনি শ্রোতাদের বুঝতে দিয়েছিলেন তার বক্তৃতা কোন প্রতিবেদন মাত্র নয়-এটা তাদের জন্যই সৃষ্টি করা। কোন শ্রোতার দল, যে বক্তা তাদের আগ্রহের বিষয়ে বলেন, তার কথা না শুনে পারেন না।

কোন বক্তব্য রাখার আগে নিজেকে একবার প্রশ্ন করে নিন আপনার বলার বিষয় শ্রোতাদের সমস্যা সমাধানে কতখানি সহায়ক হতে পারে। তারপরেই এগিয়ে চলুন। যেমন ধরুন, আপনি যদি অ্যাকাউন্ট্যান্ট হন তাহলে এই ভাবেই শুরু করতে পারেন : 'আমি আপনাদের দেখাতে চাই করের ব্যাপারে আপনারা কিভাবে পঞ্চাশ বা একশ ডলার বাঁচাতে পারেন...।' অথবা আপনি যদি একজন আইনজ্ঞ হন তাহলে শ্রোতাদের উইল করার কলা কৌশল সম্বন্ধে বলতে পারেন, আগ্রহী শ্রোতার অভাব হবে না।

লর্ড নর্থক্লিফকে যখন প্রশ্ন করা হয় 'মানুষের আগ্রহ জাগে কিসে' তিনি জবাব দেন : 'শ্রোতারা নিজেরাই নিজেদের আগ্রহ জাগায়'। এই একটি বিশ্বাসে নির্ভর করেই তিনি সংবাদ পত্রের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

'মাইন্ড ইন দি মেকিং'-গ্রন্থে জেমস হার্ভে রবিনসন অবকাশকে 'চিন্তার ক্ষেত্রে এক স্বতঃস্ফূর্ত ভাব' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে অবকাশের ফাঁকে মানুষের ধ্যানধারণা একটা নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে চলে। আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের চেয়ে আগ্রহের বিষয় আর কিছুই নেই।

ফিলাডেলফিয়ার হ্যারল্ড ডোয়াইট একবার আমাদের পাঠক্রমের এক ক্লাসের শেষ পর্যায়ে ভারি চমৎকার একটি ভাষণ দেন। তিনি তাঁর টেবিলে উপস্থিত সমস্ত লোকের সঙ্গেই এক এক করে কথা বলেন। তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেও বলেন। তাঁরা কি রকম উন্নতি করেছেন, কি ত্রুটি আছে তাদের তার অনেকখানি আবার নকল করেও দেখান। এতে বেশ হাসির ধূম পড়ে যায়। প্রত্যেকে দারুণ উপভোগ করে ব্যাপারটা। ব্যাপারটা সত্যিই আদর্শ। মি. ডোয়াইট জানতেন কিভাবে মানুষের চরিত্র নাড়াচড়া করতে হয়।

কিছুকাল আগে আমেরিকান ম্যাগাজিনের এক উঁচু কর্মী জন শিডলের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। তিনি বলেছিলেন, মানুষ বড়ই স্বার্থপর। তারা কেবল নিজেদের নিয়েই মাথা ঘামায়। তারা সরকার কিভাবে রেল চালাবেন তা নিয়ে ভাবতে চায় না। তারা শুধু জানতে চায় কিভাবে উন্নতি হবে, কি ভাবে মাইনে বাড়তে পারে, কি করে স্বাস্থ্যরক্ষা হবে ইত্যাদি। আমি যদি কাগজের সম্পাদক হতাম তাহলে আমি তাদের জানাতাম কি করে দাঁতের পরিচর্যা করা যায়, গরমে শীতল হওয়া যায়, কি করে উঁচু পদে ওঠা যায়, কর্মচারিদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়, ব্যাকরণ ভুল কী করে বন্ধ করা যায় এই সবই। মানুষ কেবল মানুষের কথাই আগ্রহ নিয়ে শুনতে চায়। তাই আমি জানাতে চাইতাম কোন লোক কিভাবে কোটিপতি হয়েছে...।'

এরই কিছু পরে শিডলকে কাগজের সম্পাদক করা হল। সাময়িক পত্রটির প্রচার সংখ্যা ছিল সামান্য। শিডল যা যা বলেছিলেন সম্পাদক হয়ে তিনি ঠিক তাই করলেন। এর ফল কি রকম হল জানেন? একেবারে অত্যাশ্চর্য। প্রচার সংখ্যা বেড়ে উঠল প্রায় দুলক্ষে। তারপর তিন চার থেকে একদম পাঁচ লক্ষে। তারপর দাঁড়াল দশ লক্ষে। এর কারণ, সম্পাদক শিডল পাঠকদের ব্যক্তিগত চিন্তা আর স্বার্থের কথাই বলেছিলেন তাঁর কাগজে।

এরপর যখন কোন শ্রোতাদের মুখোমুখি হবেন আপনারও চেষ্টা করা উচিত তাদের মনের কথা জেনে সেই বিষয়েই বক্তব্য রাখা। যে বক্তা এই সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগ তিনি দেখবেন তাঁর শ্রোতারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সভাস্থল ছেড়ে যেতেই উদগ্রীব।

২. সৎ ঐকান্তিক প্রশংসা করুন

শ্রোতারা এক একজন আলাদা মানুষেরই সমষ্টি। তারা আলাদা মানুষের মতই ব্যবহার করতে চান। খোলাখুলিভাবে কোন শ্রোতাদের একবার সমালোচনা করে দেখুন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। আবার কোনভাবে তাঁদের প্রশংসা করুন দেখবেন তাদের হৃদয় মন্দিরে ঢোকার অনুমতি পেয়ে গেছেন। অবশ্য এটা করতে গেলে আপনার ক্ষেত্রে কিছুটা গবেষণা চালাতে হবে। অথচ কেউ যদি বলেন, ‘এমন চমৎকার বোদ্ধা শ্রোতা আমি আগে দেখিনি’ তাহলে কিন্তু কাজ হবে না, কারণ বুদ্ধিমান শ্রোতারা এমন তোষামোদে খুশি হন না।

বিখ্যাত বক্তা চন্সি এম. ডিপিউ বলেন ‘শ্রোতাদের সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যা আপনি জানেন তাঁরা ভাবতেই পারবেন না।’

এসব ক্ষেত্রে এমন কিছু জানানো ঠিক হবে না যাতে আপনি ভুল করছেন মনে হবে। সেটা করলে শ্রোতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই ঘটবে। এক্ষেত্রে এটা এড়িয়ে চলাই ভালো।

৩. শ্রোতাদের একজন হয়ে উঠুন

শ্রোতাদের সামনে কোন কথা উচ্চারণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এমন কথা উচ্চারণ করুন যেন তাদের সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক রয়েছে। আপনাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে যদি সম্মানিত করা হয়ে থাকে সে কথা বলুন। হ্যারল্ড ম্যাকমিলান যখন ইন্ডিয়ানায় ডি পাও বিশ্বাবিদ্যালয়ে স্নাতক ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখন এই ভাবেই শুরু করেছিলেন।

‘আপনাদের সাদর অভ্যর্থনায় আমি অভিভূত’, তিনি আরম্ভ করেছিলেন। কারণ গ্রেট বৃটেনের কোন প্রধান মন্ত্রীকে এইভাবে আপনাদের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী পদই এই আমন্ত্রণের একমাত্র কারণ অবশ্যই নয়।

এরপর তিনি জানালেন তার মা একজন আমেরিকান মহিলা, জন্মেছেন ইণ্ডিয়ানাতেই আর তাঁর বাবা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রথম আমলের স্নাতক।

তিনি আরও বলেন, আমি আপনাদের কথা দিতে পারি ডি পাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আমি গর্বিত এবং আমার গর্ব হচ্ছে এর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক আছে বলে এবং তাকে আবার নতুন করে ভাবতে উদ্দীপনা পাচ্ছি।'

আপনারা ধরেই নিতে পারেন ম্যাকমিলান তাঁর বাবা মার সঙ্গে আমেরিকান জীবন ধারার সম্পর্কের কথা বলায় শ্রোতাদের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধু করে নিতে পেরেছিলেন।

যোগাযোগ স্থাপন করার আরও একটা পথ হল শ্রোতাদের কারও নাম উল্লেখ করে শুরু করা। আমি একবার এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তার পাশেই বসেছিলাম। হলের নানা মানুষ সম্পর্কে তার আগ্রহ দেখে বেশ অবাক হয়ে যাই। নৈশভোজের সময় সারাক্ষণ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে ভদ্রলোক প্রধান আমন্ত্রককে বারবার বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। তিনি যখন কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখনই বুঝতে পারলাম তার আগ্রহের কারণ কী। তিনি চমৎকার কায়দায় বেশ কিছু উপস্থিত ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করলেন। আমি দেখতে পেলাম তারা এতে অসম্ভব খুশিও হলেন আর তাঁদের মুখও হাসিতে ঝলমল করতে আরম্ভ করল। তাঁদের চোখে মুখে বেশ একটা উত্তাপ মেশানো বন্ধুত্বের স্পর্শ ফুটে ওঠে। সামান্য ওই কৌশলে বক্তা একাজ করতে পেরেছিলেন।

তবে এখানে একটু সতর্কতা নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটি অন্য কিছুই নয়–যে নাম আগে থেকে শুনে আপনি উল্লেখ করবেন তাদের সম্পর্কে সঠিক বিবরণ অবশ্যই জেনে নেওয়া উচিত। তাঁদের নাম উপযুক্ত সময়েই উল্লেখ করবেন।

শ্রোতাদের আরও কাছে টানার অপর কৌশল হল কথার মাঝখানে মাঝে মাঝে সর্বনাম ব্যবহার করা। কখনও তাঁরা' কথাটা ব্যবহার করবেন না বরং করবেন আপনি বা আপনারা।

আমাদের নিউইয়র্কের ক্লাসে একজন ছাত্র শ্রোতাদের সামনে সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে নিচের বিবৃতিটি দিয়েছিল :

সালফিউরিক অ্যাসিড আপনার জীবনকে নানাভাবেই ছুঁয়ে যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড না থাকলে আপনার গাড়ি থেমে যেত। কেননা এই অ্যাসিড দিয়ে কেরোসিন আর গ্যাসোলিন সাফাই হয়। যে বিদ্যুতের আলো আপনার অফিস আর বাড়িতে আলো দেয় তাও এটা না থাকলে সম্ভব হত না।

'স্নান করার সময় যে সাবান ব্যবহার করেন আপনি তাও পেতেন না এই অ্যাসিড না থাকলে, কারণ ওই অ্যাসিডেই তেল শোধন করা হয়। আপনার দাঁত মাজার ব্রাশ বা মাথার চুল আঁচড়ানোর চিরুনিই বানানো যেত না এই পদার্থ না থাকলে।'

'তাই যেখানে যেভাবেই থাকুন এই পদার্থটিকে কোন ভাবেই এড়িয়ে চলার পথ আপনার নেই।'

বেশ কৌশলে 'আপনি' কথাটা ব্যবহার করে বক্তা শ্রোতাদের একাত্ম করতে পেরেছিলেন তাঁদের প্রচুর আগ্রহীও করতে পেরেছিলেন। আবার এটাও মনে রাখবেন এই 'আপনি' সর্বনাম ব্যবহার যখন বিপজ্জনক মনে হবে তখন ব্যবহার করবেন 'আমি' বা 'আমরা'।

যেমন ধরুন একজন যদি বলেন, ‘আমরা সবাই জানতে চাই কীভাবে একজন ভাল ডাক্তার ঠিক করতে পারা যায়।’ কথাটা বলেছিলেন ড. ডব্লিউ বোয়ার। এরপর তিনি বলেন, এরপর আমরা যখন, আমাদের ডাক্তারের কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো পরামর্শ চাইবো তখন কি আমরা জানতে চাইব না ভালো রোগী কেমন করে হতে হয়?

৪. শ্রোতাদের আপনার বক্তৃতার সঙ্গী করে নিন

আপনাদের কখনও কি মনে হয়েছে আপনারা শ্রোতাদের প্রতিটি কথাতেই একটু প্রদর্শন কৌশল দেখিয়ে তাতিয়ে বা মাতিয়ে রেখেছেন? যে মুহূর্তে আপনি শ্রোতাদের কাউকে বেছে নিয়ে কোন বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে বা নাটকীয় করে তুলতে তার সাহায্য নেবেন, তখনই তাদের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন আর আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখবেন। নিজেদের শ্রোতা হিসেবে ভেবে নেওয়ার জন্য শ্রোতারা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে উঠতে চায় যে মুহূর্তে তাদের কোন ভাবে বেছে নেওয়া হয়। বক্তা আর শ্রোতাদের মধ্যে যদি কোন অলঙ্ঘ প্রাচীর থাকে তাহলে এমন কাজের ফলে সে প্রাচীরের ব্যবধান দূর হয়ে যাবেই। আমার মনে পড়ছে একবার একজন বক্তা গাড়িতে ব্রেক কষলে থামতে কতক্ষণ লাগে বোঝনোর জন্য একজন শ্রোতাকে মঞ্চে উঠে আসার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রোতাটি একটা মাপ-জোপ করার ফিতে সহ উঠে এসে সেটা টেনে মঞ্চের প্রান্ত অবধি নিয়ে যায়। সেই সময় আমি বাকি শ্রোতাদের লক্ষ্য করেছিলাম। তারা দারুণ আগ্রহ নিয়ে ব্যাপারটা শুনে যেতে চাইছিল।

শ্রোতাদের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে আমার কৌশল হল সহজে প্রশ্ন করা আর তাতেই বেশ ভালো প্রতিক্রিয়া পাওয়া। আমার কায়দা হল শ্রোতাদের কাউকে উঠে দাঁড়াতে বলে

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা। পার্সি এইচ. হুইটিং তাঁর লেখা 'হাউ টু পুট হিউমার ইন ইওর স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং'–অসংখ্য ভালো পরামর্শ এ ব্যাপারে রেখেছেন। তিনি বলেছেন শ্রোতাদের সামনে আপনার সমস্যা সমাধানের বিষয় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। মি. হুইটিং বলেছেন, 'শ্রোতাদের আমি সহকর্মী বলেই মনে করি।' একথাটাই এই পরিচ্ছেদের মূল কথা। আপনি যদি শ্রোতাদের আপনার বক্তব্যের সঙ্গী করে নিতে পারেন তাহলেই আপনার কাজ অর্ধেকটাই সম্পন্ন হবে।

৫. নিজেকে প্রকাশ করুন

বক্তা-শ্রোতাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে আন্তরিকতার কোন পরিবর্তন নেই। একবার নর্মান ভিনসেন্ট পীল তার একজন সহকারী মন্ত্রীকে খুব দামী পরামর্শ দিয়েছিলেন। মন্ত্রীটি তার শ্রোতাদের একাগ্র করতে বড়ই হিমশিম খাচ্ছিলেন, তিনি তাঁদের তাঁর মতবাদ গ্রহণ করাতে পারছিলেন না। ডঃ পীল মন্ত্রীকে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন তিনি তাঁর বিবেকের কাছে কি আদৌ জানতে চেয়েছেন তিনি শ্রোতাদের পছন্দ করেন কি না, তাঁদের সাহায্য করতে চান কি না, তাঁদের নিজের তুলনায় বুদ্ধিগত দিক থেকে নিকৃষ্ট মনে করেন কি না? ডঃ পীল বলেছেন তিনি নিজে কখনই তার শ্রোতাদের প্রতি আন্তরিক টান ছাড়া মঞ্চে ওঠেন না। কোন বক্তা মঞ্চে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতারা তাকে চুলচেরা বিচার করে ফেলার চেষ্টা করেন। বক্তা হয়তো নিজেকে তাদের তুলনায় জ্ঞানী বলেই ভাবতে চায়। তাই এসব ক্ষেত্রে শ্রোতাদের মন জয় করার সবসেরা পথই হল নিজেকে তাদের সামনে প্রকাশ করে ফেলা।

মেইনের মার্কিনী সেনেটর এডমাণ্ড এস. মাস্কি এই ব্যাপারটি বোস্টনের আমেরিকান ফরেনসিক অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেবার সময় বুঝিয়ে ছিলেন।

তিনি সেখানে বলেন, 'আজ সকালে যখন এখানে আমার কাজ করার জন্য আসি আমার বেশ সন্দেহ ছিল আমি পারব কি না। এর কারণ হল আমার শ্রোতাদের পেশাদারী গুণাবলী আর তাদের সামনে আমার সামান্য জ্ঞান প্রকাশ যুক্তিসম্মত হবে কিনা। তাছাড়া যতদিন আমি রাজনীতিগত দিক থেকে কাজে নিয়োজিত থাকব, ততদিন আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে ভেদ থাকবেই।'

'এইসব সন্দেহ নিয়েই হাজির হয়ে কোথায় শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

সেনেটর মাস্কি অবশ্য ওখান থেকেই শুরু করে চমৎকার ভাবেই এগিয়ে ছিলেন আর অমূল্য একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

অ্যাডলাই স্টিভেনসন ও এইভাবে নিজেকে বক্তৃতার সময় প্রকাশ করে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করতেন।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের সময় তিনি বলেছিলেন, এই রকম কোন অবস্থায় আমি নিজের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে বড়ই ভাবনায় পড়ে যাই। আমি এক্ষেত্রে কি করব ভাবতেই স্যামুয়েল বাটলারের মন্তব্য স্মরণ করি। সেটা হল : 'আগামী পনেরো মিনিট কিভাবে কাজে লাগাবো সেটাই আমি জানি না। আর আমার পক্ষে পরের বিশ মিনিটই আমায় ভাবনায় ফেলে দেয়।

শ্রোতাদের বিরাগভাজন করে তোলার সবচেয়ে সহজ পথ হল নিজেকে তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ভেবে বসা। আপনি যখন জনসংযোগ করেন আর তা আপনার বক্তৃতার মাধ্যমে তখন আপনি থাকেন আসলে একটা শো কেসের মধ্যে। তখন আপনার সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, আপনার দোষ গুণ, আপনার ব্যক্তিত্ব সবই। এক্ষেত্রে সামান্যতম বাগাড়ম্বর বা দম্ভ প্রকাশ করা হয়ে ওঠে মারাত্মক। অন্যদিকে আবার আন্তরিক বিনয় প্রকাশে শ্রোতারা বশীভূত হবেনই এবং সহজেই তাতে তাদের বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব। আপনি যদি জানান যে কোন বিষয়ে আপনার জ্ঞান সীমাবদ্ধ তাতে আপনার শ্রোতারা আপনার প্রতি বিরূপ না হয়ে বরং খুশিই হবেন।

সমালোচনায় রাগ করবেন না বরং সমালোচনাকে আহ্বান করাই ভালো। ঠিক এমনই করতেন আমেরিকান দূরদর্শনের এড সুলিভান। তাঁর নিজের কিছু ত্রুটি অবশ্যই ছিল! দর্শকরা এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করায় তিনি তা হাসি মুখেই গ্রহণ করতেন আর হাসতেও চাইতেন। এতেই তিনি দর্শকের একান্ত প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। আসলে দর্শকরা বা শ্রোতারা আন্তরিকতা ঘৃণা করে না।

কনফুসিয়াস সম্বন্ধে বলা হয় তিনি কোন সময়েই মানুষকে তাঁর জ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে চমকে দিতে চাইতেন না। বরং তিনি সহানুভূতির প্রলেপ দিয়ে তাদের আলোকিত করতে চাইতেন। আমাদেরও যদি এই সহানুভূতির ভাব থাকে তাহলে শ্রোতাদের হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ, সেটাই হবে চাবিকাঠি।

৬. অল্প কথায় কাজ আদায়

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একজন বিখ্যাত ইংরাজ বিশপ আপটন শিবিরে সেনাবাহিনীর সামনে কিছু বলেছিলেন। সৈন্যরা টেঞ্চে চলেছিল–তাদের খুব অল্পসংখ্যকেরই ধারণা ছিল তাদের কেন পাঠানো হচ্ছে। আমি জানি–আঁমি তাদের প্রশ্ন করেছিলাম। তাসত্ত্বেও বিশপ ওদের কাছে আন্তর্জাতিক শান্তির আর সার্বিয়ার এক মুঠো আলোর অধিকার সম্পর্কে বলেন। আশ্চর্য ব্যাপার হল ওদের অর্ধেকও জানত না সার্বিয়া কোন শহর না কোন রোগের নাম। বিশপ যদি নীহারিকা পুঞ্জ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন তাহলেও চলত। তা যাই হোক একজন সৈন্যও ঘর ছেড়ে যায়নি তিনি যতক্ষণ কথা বলেন–প্রতি দরজায় তাদের পথ আটকানোর জন্য মিলিটারি পুলিশ পাহারায় ছিল।

আমি ওই বিশপকে ছোট করছি না। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী তবে গির্জায় তাঁকে ভালো মানাত। তিনি ওই সেনাদের কাছে একেবারে ব্যর্থই হলেন। কিন্তু কেন? আসলে তিনি তাঁর বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য কি জানতেন না, আর জানতেন না কাজটা সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ কি।

বক্তৃতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কি রকম? সেটা হবে এই : বক্তা উপলব্ধি করুন বা নাই করুন প্রত্যেক বক্তৃতারই চারটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। সেগুলি কি?

সেই চারটি উদ্দেশ্য হল এই : ১। কাউকে কাজে প্ররোচিত করা বা কাজে লাগান। ২। খবর জানানো। ৩। নিশ্চিন্ত করা আর বিশ্বাস জন্মানো। ৪। মনোরঞ্জন করা।

আসুন উপরের ওই চারটি উদ্দেশ্য কী রকম তা আব্রাহাম লিঙ্কনের বক্তার জীবন থেকে কতকগুলো উদাহরণ তুলে দেখা যাক।

অনেক লোকেরই জানা আছে যে আব্রাহাম লিঙ্কন একবার বালির চড়ায় বা অন্য কোথাও আটকে পড়া নৌকা তোলার একটা উপায় বের করে সেটা পেটেন্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি আইনের অফিসের কাছে একজন যন্ত্রবিদের অফিসে কাজ করে ওই যন্ত্রটার মডেল তৈরী করেছিলেন। বন্ধুরা এসে ওই যন্ত্র দেখতে চাইলে আমাদের সামনেই লিঙ্কন তার কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর ওই ভাবে বোঝানোর আসল উদ্দেশ্যই ছিল খবর জানানো।

গেটিসবার্গে তিনি যখন তার পর পর দুটি উদ্বোধনী ভাষণ অনুষ্ঠানে তার অমর বক্তৃতা দান করেন আর হেনরী ক্লে মারা যাওয়ার পর তাঁর জীবনী নিয়ে যা বলেন–সবই তিনি করেন মানুষের মনে প্রভাব ফেলে বিশ্বাস উৎপাদন করতেই।

লিঙ্কন জুরিদের সামনে যখন কথা বলতেন তখন তিনি তার স্বপক্ষে মত আদায় করতে পারতেন। তার রাজনীতি সংক্রান্ত ভাষণে তিনি ভোট অর্জনের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য থাকত কাজ আদায়।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার দুবছর পরে লিঙ্কন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা ভাষণ তৈরী করেন। সেক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন করা। অন্তত বলা যায় এটাই তার উদ্দেশ্য হতে পারত। তবে দুঃখের কথা তাতে সেরকম সাফল্য তিনি পাননি। জনপ্রিয়

বক্তা হিসেবে তিনি একেবারে ব্যর্থ-ব্যাপারটা বেশ হতাশারও বটে। একবার কোন শহরে তাঁর ভাষণ শুনতে একজন শ্রোতাও হাজির হন নি।

তাসত্ত্বেও কিন্তু অন্যান্য বহু বক্তৃতায় তিনি দারুণ সাফল্য অর্জন করেন। তার কয়েকটা তো মানুষের ইতিহাসে প্রায় অমরত্ব লাভ করেছে। কেন? তার প্রধান কারণই হল তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিঙ্কনের বেশ পরিস্কার একটা ধারণা ছিল আর কী করে তা অর্জন করতে হবে তিনি জানতেন।

বহু বক্তাই এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় আর চরম দুঃখের শিকারও হয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : মার্কিন কংগ্রেসের একজন কংগ্রেস সভ্য নিউইয়র্কের কোন সভায় সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কারণ শ্রোতারা তাঁকে টিটকারী মারতে শুরু করে। ব্যাপারটা এই : তিনি জেনে বা না জেনেই হোক শ্রোতাদের কিছু জ্ঞান দিতে চেয়েছিলেন। শ্রোতারা কোন জ্ঞান লাভ করানো বরদাস্ত করতে পারেনি। তারা চাইছিল মনোরঞ্জন। তারা প্রথম দিকে ধৈর্য ধরেই বক্তৃতাটা শুনতে চাইলো, তাদের ধারণা ছিল আসল ব্যাপার এরপরেই আসবে। কিন্তু তা আর এলোনা-ফলে শ্রোতাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। একজন তার বিরক্তি প্রকাশ করতেই বাকিরা হাজার হাজার শ্রোতা চিৎকার, শিস দেওয়া

আরম্ভ করে। শ্রোতারা আর সহ্য করতে রাজি হয়নি। বক্তা শ্রোতাদের ওই অবস্থা দেখেও বক্তৃতা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ফলে শ্রোতারা এবার ক্ষেপে প্রায় লড়াই লাগিয়ে দিল। তাদের চিৎকারে বক্তার গলা চাপা পড়ে গেল, এমন কি বিশ হাত দূরেও

তার গলা শোনা গেল না। ভদ্রলোক এবার অপমানিত, হতাশ আর মনমরা হয়ে সভা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

এই ঘটনা থেকে সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তাই শ্রোতাদের দেখে আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েই আপনার বক্তব্য বিষয় ঠিক বেছে নেওয়া উচিত। কংগ্রেসের সদস্যটি যদি আগেই জেনে নিতেন তার বক্তব্য ওই শ্রোতাদের যোগ্য হবে তাহলে তিনি বিপদে পড়তেন না। তাছাড়া সভাটি যদি কোন রাজনৈতিক বিষয়ের হত তাহলে হয়তো এমন অবস্থা হত না। আগে বলা চারটি উদ্দেশ্য দেখে নিয়ে তবেই বক্তব্য রাখতে এগোনো উচিত।

বক্তৃতা তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যই এই পরিচ্ছেদ। এর আর এক উদ্দেশ্য হল কাজ আদায় করার জন্য ছোট ছোট বক্তৃতা। পরের তিনটি পরিচ্ছেদে থাকবে বাকি প্রধান উদ্দেশ্য গুলো : অবহিত করা খবর জানানো, নিশ্চিত করা ও বিশ্বাস জন্মানো আর মনোরঞ্জন। প্রতিটি উদ্দেশ্যেরই চাই আলাদা ধরণের ব্যবস্থাপত্র, কারণ প্রতিটির সামনে থাকে বিশেষ ধরণের বাধার প্রাচীর। এগুলো অতিক্রম করা চাই।

এবার প্রথমে আসুন শ্রোতাদের কিভাবে কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাই দেখা যাক। এই বিষয়ে শ্রোতাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করার কোন সফল পদ্ধতি আছে কি? নাকি নিছকই এটা কথার কথা।

আমার মনে পড়ছে ত্রিশের দশকে যখন সহকারীদের নিয়ে সারা দেশে ক্লাস আরম্ভ করতে ব্যবস্থা করি। আমাদের সংখ্যা অনেক ছিল বলে প্রত্যেক ক্লাসের সভ্যর জন্য মাত্র

আড়াই মিনিট সময় নির্দিষ্ট করা হয়। অবশ্য এই সময় সীমা বেঁধে দেওয়ার কোন অসুবিধা হয়নি যেহেতু সকলেরই আসল উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন করা বা কিছু বিষয় জানানো। কিন্তু যখন কাজে লাগানোর ব্যাপারটা এলো তখন অন্য ব্যাপার ঘটল। কাজে লাগানোর বক্তৃতায় কোন ফলই হতে চাইলো না যখন আমরা সেই অ্যারিষ্টটলের আমল থেকে চালু বক্তৃতার পুরনো পদ্ধতি কাজে লাগাতে গেলাম। অতএব বোঝা গেল শ্রোতাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে নিশ্চিত কোন পথ পেতে গেলে নতুন কোন উপায় এই দুই মিনিটের বক্তৃতায় চাই।

আমরা এজন্য শিকাগো, লস এঞ্জেলস আর নিউইয়র্কে সভা করলাম। আমাদের শিক্ষকদের কাছে নানা আবেদন রাখলাম। এধরণের বক্তৃতার বিষয়বস্তু জোগাড় করতে সব চেষ্টাই আমরা চালালাম।

আমরা হতাশ হইনি। নানা ধরনের ওই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা যাদুকরী ফর্মূলা আবিষ্কার সম্ভব হল। সে সব আমরা আমাদের ক্লাসে ব্যবহার শুরু করলাম-আর এখনও তা ব্যবহার করা হয়ে চলেছে। সেই ম্যাজিক ফরমূলাটি কী? ভারি সহজ ব্যাপার আর সেটা এই : যে উদাহরণ রাখতে চাইছেন সে বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ কথা শুরু করুন। তারপর বেশ স্পষ্টভাবে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করুন-শ্রোতাদের কোন্ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চান। তৃতীয়ত আপনার এই উপদেশের বা বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি রাখুন-শ্রোতাদের পক্ষে এর উপযোগিতা কতখানি।

এই ফর্মুলাটি আমাদের গতিময় অত্যাধুনিক জীবন ধারার সঙ্গে একান্ত উপযোগী। বক্তাদের পক্ষে এখন ধীর, দীর্ঘায়িত ভাষণ শুরু কখনই সম্ভবপর হয় না। অপর পক্ষে

শ্রোতাদের মধ্যে থাকে ব্যস্ত মানুষ–এই কারণেই বক্তাকে সরাসরি সহজ, সরলভাবে তার বক্তব্য রাখতেই হবে।

এই যাদু ফর্মূলা কাজে লাগানোর সময় বক্তাকে বিশেষ ভাবেই সতর্ক থাকতে হবে যাতে নীচে বর্ণিত পথে কখনও বক্তব্য রাখতে চাওয়া না হয়। যেমন—'আমার কথাগুলো তেমন ভাবে তৈরী করে আসতে পারিনি', বা 'আমাকে যখন বলার জন্য বেছে নেওয়া হল বুঝতে পারিনি আমাকে কেন নেওয়া হল'। মনে রাখবেন শ্রোতারা কখনই এধরণের মার্জনা চাওয়া বা অজুহাত পছন্দ করে না। তারা চায় কাজ। এই যাদু ফর্মূলার মধ্য দিয়ে আপনি তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটিই দিতে পারবেন।

এই যাদু ফর্মূলা কার্যকরী হওয়ার একটা কারণও আছে। এ অতি আদর্শ। কারণ এই ফর্মুলা ছোট আকারের ভাষণ বা বক্তব্যর পক্ষেই যোগ্য যেহেতু এর মধ্যে বেশ একটু রহস্য জড়ানো থাকে। শ্রোতা আপনার বলা কাহিনীতে পছন্দমত জিনিসই খুঁজে পায়-দু-তিন মিনিটের ওই ভাষণ তাকে উত্তেজিতও করে তোলে। আবার আপনার শুরু করার মধ্যে কোন ত্রুটি বা ভুল পথ থাকলে উল্টোটাই ঘটে যেতে পারে। যেমন ধরুন, কোন সভায় আপনি যদি এই বলে শুরু করেন : ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এখানে এসেছি আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ ডলার করে আদায় করতে, তাহলে সভাস্থল ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

এবার দেখুন ঠিক এমনই কোন সমাজসেবামূলক কাজে লেল্যাণ্ড কোম্পানী রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে শিশুদের জন্য কিভাবে সাহায্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন :

'আমার প্রার্থনা একাজ যেন আবার করতে না হয়। কোন শিশু আর মৃত্যুর মাঝখানে মাত্র একটা বাদাম-এর চেয়ে দুঃখজনক চিন্তা আর কি আছে? আশা করি আপনাকে একাজ কখনও করতে হবে না আর তার স্মৃতিকে পালন করতেও হবে না। আপনারা যদি জানুয়ারী মাসের কোন একদিন এথেন্সের শিশুদের কণ্ঠস্বর শুনতেন আর তাদের দৃষ্টি লক্ষ্য করতেন। ...অথচ তাদের জন্য একটিন বাদাম ছাড়া আর কিছুই রেখে আসতে পারিনি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি অস্থি চর্মসার শিশুদের নিয়ে তাদের মায়েরা আমার কাছে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।'

'তাদের উন্মত্ততা আমাকে যেন ভাসিয়ে দিতে চাইছিল। আমার চোখের সামনে শুধু শত শত মেলে ধরা হাত। সে হাত ভিক্ষা চাইছিল। কিন্তু আমি শুধু কতকগুলো বাদাম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলাম না।...হ্যাঁ, এ অভিজ্ঞতা যেন আপনাদের কারও না হয়।'

এই যাদু ফর্মুলা ব্যবসা সংক্রান্ত লেখাতেও কাজে লাগাতে পারা যায়। এছাড়াও সহকর্মী আর অধঃস্তন কর্মীদের উপদেশ দানেও কাজে লাগানো চলে। মেয়েরা তাদের সন্তানদের কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতেও এটিকে কাজে লাগাতে পারেন। এর এক সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। আপনার দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রেও দেখবেন মনস্তত্ত্বের দিকে এর আবেদন অনস্বীকার্য।

এমন কি বিজ্ঞাপনের কাজেও এই ফর্মুলার আবেদন অস্বীকার করার উপায় নেই। এভারেডী ব্যাটারী প্রতিষ্ঠান ইদানীং এই যাদু ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে দূরদর্শনে কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে কোন বিশেষ একজনের একরাতের অভিজ্ঞতা, যেমন তার গাড়ি উল্টে যাওয়ার বিষয়ে বর্ণনা দেয়। এই বর্ণনা দেওয়ার পর

সেই মানুষটি জানায় কিভাবে গাড়ির হেডলাইটের আলোর সাহায্য পেলেন-সেই আলো অবশ্যই এভারেডী ব্যাটারীর সাহায্যে জ্বলেছিল। এরপর ঘোষক জানায়, এভারেডী ব্যাটারী কিনে বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। আমার অবশ্য জানা নেই এই অনুষ্ঠান দেখে এভারেডী ব্যাটারীর বিক্রি কি পরিমাণে বেড়েছে, তবে এটা জানি এই যাদু ফর্মুলায় দর্শকরা জানতে পারেন এমন অবস্থায় কি করতে হবে। এরই বা মূল্য কম কি। এই ফর্মূলাতেই জানা যাবে কি করণীয় বা কি করা উচিত নয়।

১। নিজের জীবনের কোন ঘটনা বর্ণনা করুন

আপনার বক্তব্যের বেশির ভাগ অংশই জুড়ে থাকবে এই জীবন কাহিনীর টুকরো কথা। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে আপনি শ্রোতাদের শোনাবেন আপনার অভিজ্ঞতার কাহিনী যা থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। মনস্তত্ববিদরা বলেন আমরা দুটো পথে শিক্ষালাভ করি : এক কার্যকারীতার লিখনে, যাতে পরপর ঘটমান বহু ঘটনা আমাদের ব্যবহারিক জীবনধারা বদলে দিতে পারে। আর দুই, ফলাফলের নিয়মে, যাতে যে কোন একটি মাত্র ঘটনাও জীবনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আমরা সকলেই আমাদের জীবনে এধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করি। এসব ঘটনার কথা আমাদের হাতড়ে বেড়াতে হয় না কারণ সেগুলো আমাদের স্মৃতির উপরের স্তরেই ভাসমান অবস্থায় থাকে। আমাদের ব্যবহার অনেকটাই এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই সব ঘটে যাওয়া ঘটনাকে পুরোপুরি জীবন্তভাবে বর্ণনা করে আমরা অন্যদের ব্যবহার প্রভাবিত বা বদল করতে পারি। এর একটা আশ্চর্য রকম কারণ বর্তমান–যেহেতু ওই ঘটনার শরিক হলে মানুষের যা হত, কথায় হুবহু বর্ণনা করলে অনেকটা সেই অভিজ্ঞতাই হয় মানুষের। অতএব আপনি যখন আপনার জীবনের সেই ঘটনা বর্ণনা করবেন তখন এমন সজীব

করে তুলবেন যে বর্ণনাকে যেন শ্রোতারাও সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। এজন্য আপনাকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হতে পারে–আর সেটা নির্ভর করবে আপনি কতটা জীবন্ত করতে পারেন আপনার বক্তব্য তারই উপর।

নিচে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা থেকে আপনার কার্যকারী ছোট্ট কথিকা স্পষ্ট, আবেগময় আর অর্থময় হয়ে উঠতে পারবে।

ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ রাখুন

ঘটনামূলক কোন উদাহরণ যদি এমন কোন উদাহরণ হয় যা আপনার জীবনে বেশ নাটকীয় প্রভাব ফেলেছে। তাহলে তার শক্তি এক্ষেত্রে হয় চমৎকার। সে ঘটনা হয়তো অল্প কোন সময়ের তবুও তা যেন আপনার জীবনে এমন ছাপ রাখে যা থেকে আপনি অবস্মিরণীয় কোন শিক্ষাই পেয়ে থাকতে পারেন। খুব বেশি দিন নয়, আমাদেরই একজন আমাদের ক্লাসে এই রকম একটা উদাহরণ রাখেন। ঘটনাটা তার জীবনের–নৌকা উল্টে যাওয়ার পর তার সাঁতারে জীবন বাঁচানোর চেষ্টার ভীতিকর কাহিনী। আমার ধারণা তার কাহিনী শোনার পর প্রত্যেক শ্রোতাই এ ধরণের অবস্থায় পড়লে বক্তার মতই উল্টো নৌকার উপর পড়ে থেকে সাহায্যের অপেক্ষা করতে চাইবে। আর একজন শোনান খড় মাড়াই করার কোন উল্টে পড়া কল আর এক শিশুর কাহিনী। বর্ণনাটা এতই জীবন্ত হয়েছিল যে আমার মনে গেঁথে আছে। তাই শ্রোতাদের মতই আমরা সকলেই নিশ্চয় বাড়িতে ওই ফল সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে চেয়েছি। আমাদের ক্লাসে আরও এমন অনেক কাহিনী শোনা গেছে। এমন এক কাহিনী ছিল রান্নাঘরের

গ্যাস থেকে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কাহিনী। আমার বিশ্বাস ওই কাহিনী শুনে অনেকেই হাতের কাছে আগুন নেভানোর যন্ত্র রেখে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এই কারণেই বলছি আপনার জীবনের চিত্তাকর্ষক যে কোন ঘটনার সজীব বর্ণনার অদ্ভুত মাদকতাময় ক্ষমতা থাকে। শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করা যায় এটা দিয়ে। এর কারণ আপনি শ্রোতাদের বলবেন এমন অবস্থায় পড়লে কি করা দরকার।

খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে কথা শুরু করুন

উদাহরণ দিয়ে কথিকা শুরু করার কারণ হল চট করে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। দেখা গেছে বহু বক্তাই একাজে গোড়াতেই ব্যর্থ হন যেহেতু তারা নানা রকম বাড়তি বক্তব্য রাখতে চান, কৌশল করতে চান, মাঝে মাঝে মার্জনা চান। শ্রোতারা এসব পছন্দ করে না। যেমন ধরুন কেউ যদি বলেন, বক্তৃতা দিতে আমি তেমন অভিজ্ঞ নই,- এ ধরণের কথা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এছাড়াও অন্য কিছু পথ এড়িয়ে চলা ভালো। যেমন, ধরুন : যে ঘটনা সম্পর্কে বলবেন সে সম্বন্ধে ভালো তৈরি না থাকা বা কোন উপদেশ দান করেই শুরু করা।

"জনসংযোগের সহজ পদ্ধতি"

এবার এ বিষয়ে কি করণীয় তা বিখ্যাত সাময়িক পত্র আর সংবাদপত্রের লেখকদের কাছে শুনুন : '১৯৪২ সালে আমায় এক হাসপাতালের শয্যায় আশ্রয় নিতে হয়' বা 'গতকাল আমার স্ত্রী যখন কফি ঢালছিলেন...', বা 'গত জুলাইতে আমি যখন ৪২ নং

হাইওয়ে ধরে জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম...', এই ধরণের কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করলে ফল লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

আসলে আপনি যদি আপনার কথিকা এমন সমস্ত কথা দিয়ে শুরু করেন যাতে এই সব প্রশ্নের অর্থাৎ কে? কখন? কোথায়? কি? কিভাবে? বা কেন-উত্তর থাকে, তাহলে জানবেন সেটা হবে সেই প্রাচীনতম পদ্ধতি। অর্থাৎ এর মধ্যে থাকছে একটি গল্পের সম্ভাবনা। অনেকদিন আগে'-এই কথা দিয়ে সুরু করলে দেখতে পাবেন শিশুদের কল্পনার জগৎ কেমনভাবে খুলে যায়। বয়স্কদের ব্যাপারেও তাই ভুলবেন না। প্রথম কথা দিয়ে তাদেরও আপনি জয় করতে পারেন।

হাসির গল্প দিয়ে শুরু করবেন না।

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে নতুন কোন উঠতি বক্তা প্রায়ই ভাবে বক্তা হিসেবে একটু মজার চরিত্র হওয়াই ভালো। তার মধ্যে হয়তো কোন রকম সরলতার চিহ্নও নেই, অথচ মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় বুঝি স্বয়ং মার্ক টোয়েনই ভর করেছে তার উপর। অতএব সে তথাকথিত কোন হাসির গল্প দিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করতে যায়। বিশেষ করে সময়টা যদি নৈশভোজনের পর হয়। ফল কি রকম হয় এতে? ফলে হয় কুড়ির মধ্যে ঊনিশ বারই চরম ব্যর্থতা-অর্থাৎ শ্রোতাদের আগ্রহ জাগেনা।

এর কারণ হল মানুষকে প্রাণ খুলে হাসানো সবচেয়ে কঠিন কাজ–এজন্য দরকার নিরবচ্ছিন্ন অধিকার। এ অনেকটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত চরিত্রের আর ব্যক্তিত্বের উপর। এ অনেকটা জন্মগত ক্ষমতা-সকলের এ ক্ষমতা থাকে না। কোন হাসির গল্প হাসির

উদ্রেক করবেই এর কোন নির্দিষ্ট কারণ কখনও থাকে না–কারণ এ গল্প বলার সার্থকতা নির্ভর করছে বক্তার বলার ভঙ্গির উপর। মার্ক টোয়েনের পক্ষে যা সম্ভব অপরের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। মনে রাখা দরকার কোন গল্প বলে মার্ক টোয়েন যেভাবে খ্যাতি অর্জন করেন অন্যের পক্ষে তা আকাশ কুসুম।

লিঙ্কন যে কাহিনী শুনিয়ে একদিন বিখ্যাত হন সে কাহিনী পড়ে নিতে পারেন আপনারা। লিঙ্কনের কাহিনী শোনার জন্য মানুষ বহু মাইল দূর থেকে চলে আসত। সারারাত ধরেই তারা তা শোনার অপেক্ষায় থাকত।

শ্রোতাদের সহজে খুশি করার একটা পথ হল নিজের সম্পর্কে ঠাট্টা করা। বিখ্যাত বক্তা এডউইন জেমস ক্যাটেল বলেছেন তিনি জীবনে কখনও মজার কোন কাহিনী শোনান নি। তাঁর মতে যে কোন কাহিনীকে হতে হবে প্রয়োজনীয়, বিশ্বাসযোগ্য।

তাহলে কি শুরু করা দরকার গুরুগম্ভীর কোন বিষয় দিয়ে? না, তাও নয়। এমন বিষয় দিয়ে শুরু করুন যা শ্রোতাদের মনোমত হতে পারে, যার বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে আগ্রহ জাগে।

২. নিজের বক্তব্য রাখুন, শ্রোতাদের কাছে কি চান

বলুন কাজ আদায় করার জন্য যে উদাহরণ রাখলেন, তাতে আপনার সময়ের তিন চতুর্থাংশ খরচ হয়ে গেছে। ধরুন আপনি দু'মিনিট কথা বলেছেন। তাহলে আপনার হাতে আর বিশ সেকেণ্ডই আছে যাতে শ্রোতাদের কাছে যে বক্তব্য রেখেছেন তাদের কাছে কাজ পেতে, তার পুরো ফল লাভের জন্য। বিশদ বর্ণনার সময় আর নেই। এখন

সরাসরি কাজের সময় উপস্থিত এ হল সংবাদপত্রের ঠিক বিপরীত কাজ। প্রথমেই হেডলাইন যা দিয়ে আপনি প্রথমে দেবেন কাহিনীর সার বস্তু। তারপর ওই হেডলাইন দিয়ে কাজের আবেদন জানাবেন। এটা তিনটি নিয়ম মেনে চলা যায় :

আপনার মন্তব্য সংক্ষিপ্ত আর নির্দিষ্ট করুন

শ্রোতাদের কাছে কি চাইছেন স্পষ্ট করুন। শ্রোতারা যখন স্বচ্ছভাবে সব বুঝতে পারবে তখনই কাজ হবে। যেমন ধরুন পরোক্ষ কোন ইঙ্গিত দিলে তাতে কাজ হয় না। যেমন এরকম বললে কাজ হবে না : স্থানীয় অনাথ আশ্রমে আপনারা সাহায্য দিলে উপকার হয়। বরং যদি সরাসরি প্রত্যক্ষ কোন কাজের বিষয় বলা যায়, যেমন : আগামী রবিবার অনাথ আশ্রমে পঁচিশটি ছেলেকে চড়ুইভাতি করাতে নিয়ে যাবেন আপনারা এতে ঢের বেশি সাড়া মেলে। যেমন ধরুন যদি বলা যায় : আপনাদের দাদু-দিদিমাদের দেখাশোনা করা উচিত। বরং যদি বলেন : 'প্রতি সপ্তাহ শেষে দাদু-দিদিমাকে দেখে আসুন', তাহলে অনেক কাজ হবে।

সহজ করে বলুন, কাজ হবে

বক্তব্যের বিষয় যাই হোক না কেন, তাকে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হওয়ার কাজটি নির্ভর করে বক্তারই ভঙ্গির উপর। বক্তাকে এমন ভাবে তা বলতে হবে যাতে শ্রোতারা সহজে কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। মনে করুন আপনি চাইছেন শ্রোতাদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে তোলার কাজ করতে। এটা করতে হলে এরকম কখনই বলবেন না : এই মুহূর্ত থেকে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে চেষ্টা করুন। এটা এতই সাধারণ কথা যে কাজে লাগানো শক্ত। বরং

বলতে পারেন : ‘কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে পরের পাঁচ মিনিট তার নাম অন্তত পাঁচবার মনে করুন। এ হল সরাসরি কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান।

যে সব বক্তারা বর্ণনামূলক কাজের ব্যাখ্যা করেন তারা অন্যদের চেয়ে ঢের ভালভাবে শ্রোতাদের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। আপনি যে কথা বলবেন সেটা নঙর্থকভাবে বা সোজাসুজি বলবেন তা নির্ভর করছে শ্রোতাদের মনোভাবের উপর। নঙর্থক দিক থেকে বক্তব্য পেশ করলে দেখা গেছে শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া হয় অনেক বেশি। কিছুদিন আগে ইলেকট্রিক বাল্ব বিক্রির কোন এক বিজ্ঞাপনে এই রকম নর্থক কথা কাজে লাগানো হয় এইভাবে : বাল্ব চুরি করা উচিত নয়।

প্রত্যয়ী ভঙ্গীতে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য রাখবেন

যে কথা বলতে চান সেটাই আপনার মূল সূত্র। অতএব সেটা এমনভাবে শ্রোতাদের সামনে রাখবেন যেন তার পিছনে প্রত্যয় আর দৃঢ়তা থাকে। খবরের কাগজে যেমন হেডলাইন থাকে, তারপর থাকে বর্ণনা। ঠিক সেই ভাবেই আপনার বক্তব্যের সারটুকু আগেই দৃঢ়ভাবে বলে ফেলুন। শ্রোতাদের মাঝে আপনার ছাপ ফেলতেই হবে, তাই কাজটা এমনভাবে করবেন যেন শ্রোতারা আপনার আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে। এভাবে বলতে পারলে সেই যাদুকরী ফর্মূলার তৃতীয় ধাপ চমৎকার কাজে লাগানো হয়ে যাবে।

৩। শ্রোতাদের চাহিদা মত ব্যাখ্যা রাখবেন

একাজ করার সময়ও চাই ছোট করে বলার ক্ষমতা আর সূক্ষ্মতা। এই ব্যাখ্যা করার কাজে বক্তাকে শ্রোতাদের জানাতে হবে তারা এ থেকে কি ধরণের শিক্ষা লাভ করতে পারে বা পুরস্কার পেতে পারে।

মনে রাখা চাই ব্যাখ্যাটি যেন বক্তব্য অনুযায়ী হয়

জনসংযোগের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। এই বিষয়টি বিশাল আর অপরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরও তাতে সন্দেহ নেই। এই পরিচ্ছদে, যে ছোট কথিকায় শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করা যায় সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাতে অল্পকথায় বেশি লাভের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মনে রাখবেন উদাহরণ হিসেবে যা বলবেন আপনার শ্রোতাদের কাছে চাহিদাও যেন তার সঙ্গে মিল রেখেই বলা হয়। যেমন ধরুন, পুরনো গাড়ি কিনে আপনার যা অর্থকরী লাভ হয়েছে এবং তার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া চাই শ্রোতাদের একাজ করলে তাদের কি লাভ হবে।

মনে রাখবেন একটি মাত্র ব্যাখ্যাই শুধু দিতে হবে

বেশিরভাগ বিক্রয় প্রতিনিধিই তার পণ্যসামগ্রী সম্বন্ধে অন্তত আধ ডজন ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে পারেন তার পণ্য কেন কেনা উচিত। আপনার ব্যাপারেও ঠিক তাই হতে পারে– অর্থাৎ আপনার বক্তব্য যে ঠিক তার জন্য আপনিও অন্তত আধ ডজন কথা বলতে পারেন। তবু এটা ঠিক যে সব কটি কারণের মধ্যে মাত্র সেরা একটিই বেছে নিয়ে তাই বলা উচিত। এই একটার উপর নির্ভর করেই আপনার বক্তব্য প্রমাণ করতে হবে। বিজ্ঞাপনের যেমন কোন পণ্য সম্পর্কে এককথায় অনেকখানি বলা যায়। আপনার কথার

সমর্থনেও তাই করতে হবে। এই বিজ্ঞাপন যদি ভাল করে কয়েকবার পড়েন তা হলেই কথাটির সারমর্ম বুঝতে অসুবিধা হবে না। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা এই কাজে সত্যিই সার্থক-এগুলো লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে একটা বিজ্ঞাপনে নানা সুবিধার কথা কেউ বলে না। এক্ষেত্রে একটা বিষয়েই জোর দেওয়া হয়।

বেতার, দূরদর্শন বা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে দেখলেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সেই যাদু ফর্মূলা তারা কেমন সুন্দরভাবেই কাজে লাগায়। কোন পণ্য কেনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই কিন্তু ওই বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য।

এধরণের উদাহরণ অবশ্য অন্যভাবেও দেওয়া যায়। যেমন কোন উদাহরণ দেখিয়ে, কোন কিছু করে 'দেখিয়ে, ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সম্পর্কে তেরো পরিচ্ছেদের দীর্ঘ বক্তৃতার কথায় বলা হবে। এক্ষেত্রে অর্থাৎ ছোট্ট কথিকার ব্যাপারে যেটায় ব্যক্তিগত ছোট্ট উদাহরণ রাখা হয়। সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই শ্রোতাদের উদ্যোগী হতে খুবই কার্যকর ভূমিকা নেয়।

৭. জানাবার জন্য বক্তৃতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সভায় একবার জনৈক বক্তা এমন বক্তৃতা করেন যে শেষপর্যন্ত সভার সকলে বেশ বিরক্তই বোধ করতে আরম্ভ করেন। এ কাহিনী হয়তো কেউ কেউ শুনেও থাকবেন। ভদ্রলোক ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, অথচ কথা বলার কৌশল তাঁর একেবারেই জানা না থাকায় অনেকক্ষণ ধরে শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবেই বকে যান তিনি। কোন রকমেই তাঁর বক্তব্যের বিষয় পরিষ্কার হলনা। ফলে যা হওয়ার তাই হয়, কমিটির সদস্যদের মধ্যে অসহিষ্ণুভাব জাগতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ম্যানুয়েল জেমস আরভিন জুনিয়র, নামে একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে বেশ চোখা একটা মন্তব্য শোনালেন।

তিনি বলেছিলেন মাননীয় বক্তার কথা শুনে তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে। ভদ্রলোক তাঁর উকিলকে জানান তিনি তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ অর্থাৎ ডাইভোর্স করতে চান, যদিও স্ত্রী সুন্দরী, চমৎকার রাঁধতে পারেন আর মা হিসেবেও ভালো, একেবারে আদর্শ।

তাহলে বিচ্ছেদ চাইছেন কেন?’ উকিল জিজ্ঞাসা করলেন।

‘কারণ সে সারাক্ষণ বকবক করে’, স্বামী উত্তর দিলেন।

‘কোন্ বিষয়ে বকবক করেন?’

'সেটাই তো ঝামেলা', স্বামী জবাব দিলেন।

বহু বক্তার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা, তা তিনি স্ত্রী বা পুরুষ যাই হোন। তাদের শ্রোতারা জানে না তাঁরা কি বলতে চান। তাঁরা তা বলেন না। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট করেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদে আপনারা শ্রোতাদের কাছ থেকে কাজ আদায় সম্পর্কে ফর্মুলার কথা পড়েছেন। এবার আপনাদের শোনাবো কিভাবে শ্রোতাদের আপনার বক্তব্য জানাতে পারেন, এবং কিভাবে তাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হয়।

মনে রাখবেন প্রায় প্রতিদিনই আমরা এই তথ্য জানিয়ে কথাবার্তা বলি–যাতে আমরা অনেক আদেশ দিই, ব্যাখ্যা করি, ইত্যাদি। সারা বছর ধরে আমাদের পাঠক্রমের ক্লাসে যে সব পরামর্শ দেওয়া হয় তার মধ্যে এই তথ্য জানান দেওয়া হল কাজে উদ্বুদ্ধ করার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিষ্কার, স্পষ্টভাবে বক্তব্য রাখতে পারলে অপরকে চট করে কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এ সম্বন্ধে আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পতি ওয়েন ডি, ইয়ং বলেছেন আজকের দুনিয়ায়, এই স্পষ্ট বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। তিনি যা বলেছেন সেটা এই রকম :

'কোন মানুষ যখন অপরকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে পারেন, তিনি ততটাই নিজের প্রয়োজনীয়তা বাড়াতে পারেন। আমাদের সমাজে নিশ্চিত ভাবেই মানুষকে ছোটখাটো ব্যাপারেও পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। এ জন্য প্রথমেই তাদের ভাষাই হবে

প্রধান অবলম্বন, অতএব আমাদের এটার ব্যবহার করা শিখতে হবে, নিছক ব্যবহারের জন্য নয়, অত্যন্ত কৌশলে।'

এই পরিচ্ছেদে আপনার কাছে উপস্থিত করা হচ্ছে কিভাবে স্পষ্ট, পরিষ্কার ভাবে শ্রোতাদের সামনে নিজেকে হাজির করতে পারবেন যাতে আপনাকে বুঝে নিতে তাদের কোনই অসুবিধা না হয়। লর্ড উইগ উইটগেনস্ক্রিন বলেন, সবকিছু যদি ভালভাবে চিন্তা করা যায় এবং তাই পরিষ্কার ভাবে বলাও যায়।

১. আপনার হাতের সময় অনুযায়ী বক্তব্য রাখুন

শিক্ষকদের কাছে কথা বলার এক ফাঁকে প্রফেসর উইলিয়াম জেমস মন্তব্য করেছিলেন যে কোন বক্তা বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটা সময় একটা বিষয় নিয়েই বক্তব্য রাখতে পারেন। যে বক্তৃতার কথা তিনি বলেছিলেন তাতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। তবুও ইদানীং একজন বক্তাকে আমি বলতে শুনি মাত্র তিন মিনিট সময় দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এগারোটি বিষয় নিয়ে বলবেন। ভাবুন, প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে সময় মাত্র সাড়ে ষোল সেকেণ্ড। শুনে অসম্ভব আর অবাস্তবই মনে হবে যে, কোন বুদ্ধিমান বক্তা এমন অবাস্তব কাজ করবেন।

যেমন ধরুন, আপনি যদি কোন শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে কিছু বলতে চান তাহলে তিনি কি ছ' মিনিটে কখনই বলার চেষ্টা করবেন না এই শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম হয় কেমন করে, তাদের কাজের ধারা কেমন। কি কি ভাল কাজ তারা করেছে আর কলকারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ কিভাবেই বা সমাধান করা যায়। না, এসব ব্যাপারে কখনই কিছু ওই

অল্প সময়ে বলার চেষ্টা করবেন না। করণ তাতে শ্রোতারা। বিষয়টা আদৌ ভালভাবে বুঝবে না। আসলে এতে আপনার বক্তব্য হয়ে দাঁড়াবে গোলমেলে অস্পষ্ট।

মনে রাখবেন বহু অভিজ্ঞ বক্তারাও এরকম মারাত্মক রকম ভুল করে থাকেন। আসলে অন্য ব্যাপারে তাদের দক্ষতা থাকায় তারই অহঙ্কারে এটা চাপা পড়ে যায়। আপনি এ পথ তাই পরিহার করবেন।

২. আপনার ধারণা সাজিয়ে নিন

প্রায় সব বিষয়েই যুক্তি পূর্ণ ধারাবাহিকতা দিয়ে গড়ে তোলা যায়। এটা করার জন্য কাজে লাগাতে হবে সময়, অবকাশ, আর বিশেষ বিষয়কে। সময়ের ব্যাপার যেমন ধরা যাক, আপনি আপনার বক্তব্যকে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত এই তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারেন। ধরুন, আপনি কোন একটা তারিখ দিয়ে শুরু করার পর অতীতে চলে গেলেন তারপর আবার এগিয়ে এলেন। যে সব বক্তব্যের বিষয় কোন গঠনমূলক কিছুতে নিবদ্ধ থাকে সেটা শুরু করতে হয় প্রথমেই কাঁচা মাল দিয়ে। তারপর ধাপে ধাপে তাকে বিভিন্ন পথে এগিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্যে পরিণত করতে হয়। বক্তব্যে কতখানি বর্ণনা রাখবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার হাতে সময় কতটা আছে।

অবকাশের ব্যাপারে আপনি এগিয়ে চলবেন আপনার ধারণার বিষয় বস্তুকে সাজিয়ে। এখান থেকেই আপনি অগ্রসর হবেন। যেমন ধরুন আপনি যদি ওয়াশিংটনের ক্যাপিটেল প্রাসাদের বর্ণনা দিতে চান তাহলে আপনি শুরু করবেন একদম এর চূড়ো থেকে। তারপর একটু একটু করে চারপাশের বর্ণনা দেবেন। কোন জেটের ইঞ্জিন বা মোটর

গাড়ির ইঞ্জিনের বর্ণনা দিতে গেলে সবচেয়ে ভাল হয় ইঞ্জিনকে টুকরো করে তার ব্যাখ্যা দিয়ে।

৩. এগিয়ে চলার পথে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন

কোন বক্তব্যকে শ্রোতাদের মনে আগ্রহের আর সজীব রাখতে গেলে বক্তৃতা চলার ফাঁকে পরিষ্কারভাবে শ্রোতাদের বলতে চাইবেন, বিষয়গুলো পর পর সাজিয়ে বলবেন। 'আমার প্রথম কথা হল এই...', আপনি এই রকম সাদামাটা ভাবেও শুরু করতে পারেন। এইভাবেই পরপর শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন।

ড. রালফবাঞ্চ, রাষ্ট্রপুঞ্জের তৎকালীন অ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারী, নিউইয়র্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা এইভাবে আরম্ভ করেছিলেন :

'আজ সন্ধ্যায় আমি এই বিষয়ে যা বলব ঠিক করেছি তাহল 'মানবিক সম্পর্কের সংঘাত'। এটা করতে চাই দুটি কারণে, তিনি বলেন, প্রথমত এই...', তারপরই তিনি বলেন, 'দ্বিতীয়ত এই...'। তাঁর বক্তৃতায় সারাক্ষণই তিনি এইভাবে পরপর তাঁর বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। একেবারে উপসংহারে তিনি বলেন :

'আমাদের কখনই মানুষের ভালো করার সুপ্ত ক্ষমতার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।'

ঠিক এই রকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল এইচ, ডগলাস ব্যবসা ও উৎপাদনে দেশে ভাঁটা দেখা দেওয়ায় উৎসাহ দিতে। তিনি ছিলেন কর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং ইলিনয়ের সেনেটর হিসেবে তার সারগর্ভ বক্তৃতা রেখেছিলেন।

তিনি শুরু করেন এইভাবে : আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল এই : নিম্ন আর মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের জন্য কর রেহাইয়ের উপযুক্ত পদ্ধতি-অর্থাৎ যে আয়ের মানুষেরা তাদের আয়ের শেষ কপর্দকও খরচ করতে বাধ্য হন।

তিনি এরপর বলেন, এর তিনটি প্রধান কারণ বর্তমান...প্রথম... দ্বিতীয়...তৃতীয়।

৪. অচেনাকে চেনার সঙ্গে তুলনা করুন

মাঝে মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজেকে বেশ একটু বেকায়দায় পড়েছেন বলে মনে হতে পারে–অর্থাৎ আপনার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে। বিষয়টা হয়তো বা আপনার কাছে বেশ পরিষ্কার–কিন্তু নিজের কাছে পরিষ্কার হলেই হবে না, শ্রোতাদের কাছেও তা স্পষ্ট হওয়া চাই। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

ধরুন আপনি শ্রোতাদের কাছে রসায়ন শাস্ত্রের অবদান সম্পর্কে বলতে চান–বিশেষ করে অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট সম্পর্কে। এই পদার্থটি নিজে পরিবর্তিত না হয়ে দুটি পদার্থকে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা খুবই সহজ। এটা বোঝানোর জন্য বলতে পারেন অনুঘটক হল এক স্কুলের বড়সড় দুষ্টু ছেলের মত–সে সারাক্ষণ ছোট ছোট ছেলেদের মারধর করে অথচ তার কিছু কেউই করতে পারে না।

একবার একদল মিশনারী আফ্রিকার মধ্যাঞ্চলে ধর্ম প্রচার করার সময় বাইবেলের কাহিনীকে বাধ্য হয়ে স্থানীয় আদিবাসীদের কথ্য ভাষায় অনুবাদ করতে বাধ্য হন। তারা নিজেরা কি বাইবেলকে সরাসরি অনুবাদ করলে কাজ হত। একেবারেই না–কারণ

অশিক্ষিত ওই অধিবাসীরা তার কিছুই বুঝত না। যেমন ধরুন বাইবেলের এই লাইনটি : ‘তোমার পাপের রঙ রক্তবর্ণ হলেও তা তুষারের মত শুভ্র হবে। এখন তুষার আর শ্যাওলার তফাত ওই অধিবাসীরা বুঝত না। অতএব মিশনারীরা প্রয়োজনে লাইনটা বদলে নিয়েছিলেন এইরকম করে : ‘তোমার পাপ রক্ত লাল হলেও তা নারকেলের শাঁসের মতই সাদা হবে।’

অবস্থা বিবেচনায় এর চেয়ে আর কি করণীয় থাকতে পারে?

কোন ঘটনাকে ছবির মত করে তুলুন।

পৃথিবী থেকে চাঁদ কত দূরে? সূর্য? অথবা সবচেয়ে কাছের কোন গ্রহ। বিজ্ঞানী মহাকাশ অভিযানের বর্ণনা অঙ্কের মাধ্যমেই দেবেন। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তা আর লেখকরা জানেন সাধারণ শ্রোতাদের বোঝানোর পথ এটা নয়। তারা অঙ্ককে ছবিতে পরিণত করেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্স বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করতেন সাধারণ মানুষ যাতে পৃথিবীর আর মহাবিশ্বের রহস্য জারতে পারে। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর দক্ষ মানুষ হিসেবে স্যার জেমস জিনস্ জানতেন বিজ্ঞানে অঙ্কের স্থান কোথায়। তাই যখন সহজবোধ্যভাবে তিনি বিজ্ঞানের কথা বলতেন বা লিখতেন তার পক্ষে কোথায় অঙ্ক এড়িয়ে যেতে হবে তা তিনি জানতেন।

আমাদের সূর্য (সূর্যও একটি তারা) আর আমাদের গ্রহের চারপাশের গ্রহগুলো এতই কাছে যে আমরা বুঝতে পারি না মহাজগতের অন্যান্য বস্তুরা কতদূরে অবস্থিত।

ব্যাপারটা স্যার জিনস্ তাঁর আমাদের চার পাশের মহাবিশ্ব বইটিতে বুঝিয়ে বলেছেন। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন, 'আমাদের সবচেয়ে কাছের তারাটি (প্রক্সিমা সেন্টাউরি) রয়েছে ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে। তারপর দূরত্বটা ভাল করে বোঝাতেই তিনি লিখেছেন কেউ যদি আলোর গতিতে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে প্রক্সিমা সেন্টাউরির দিকে যাত্রা করে তাহলে সেখানে পৌঁছতে তার চার বছর তিন মাস সময় লেগে যাবে।

এই ভাবেই স্যার জিন্স অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের দূরত্বকে বেশ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। আমি একবার এক বক্তাকে আলাস্কার আয়তন বোঝাতে শুনি। তিনি স্রেফ বলেন আলাস্কার আয়তন হল ৫৯০,৮০৪ বর্গমাইল। এর বেশি আর কিছুই তিনি বলেন নি।

এথেকে কারও পক্ষে কি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাজ্যটির আসল আয়তন আন্দাজ করা সম্ভব? রাজ্যটি কতটা বড় জানতে আমায় বেশ অপেক্ষাই করতে হয়, যখন আর একজন বক্তা জানালেন–আলাস্কার আয়তন হল ভারমন্ট, নিউ হ্যাম্পশায়ার, মেইন, ম্যাসাচুসেট্স, রোড আইল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, ডেলাওয়ার, মেরীল্যাণ্ড, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, উত্তর ক্যারোলিনা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, টেনেশী আর মিসিশিপির মিলিত আয়তনের সমান। এবার ৫৯০,৮৪০ বর্গমাইল কতটা হতে পারে তার একটা ধারণা পেলাম। নড়াচড়া করার মত ভাল জায়গাই তো তবে আলাস্কায় রয়েছে।

কয়েক বছর আগে আমাদের ক্লাসের এক সদস্য আমাদের দেশের রাজপথে যে ভয়ঙ্কর সব দুর্ঘটনা ঘটে তার এক ভয়াল বিবরণ দেন : ধরুন আপনি নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলস চলেছেন। এবার রাস্তার পাশ চিহ্নের বদলে কফিন সাজানোর রয়েছে ভাবতে পারেন-আর প্রতিটি কফিনে ভরা আছে গতবছরে দুর্ঘটনায় মৃত এক একজন মানুষ। যতই গাড়িতে এগোবেন ততই পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর ওই কফিন আপনার চোখে পড়বে। অর্থাৎ সারা দেশ জুড়ে প্রতি মাইলে এ রকম বারোটা কফিন দেখবেন।

পথ দুর্ঘটনা শিকারের এমন নিখুঁত বর্ণনা আর হতে পারে না। যখনই আমি গাড়িতে যাই বিবরণটা আমার চোখে ভেসে ওঠে।

এর কারণ কি? কারণ হল কানে শোনা বর্ণনা বেশি কাল মনে থাকেনা। এটা মিলিয়ে যায়। কিন্তু চোখে দেখা কিছু তা যায় না। কয়েক বছর আগে আমি দানিয়ুব নদীর তীরে একটা বাড়িতে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর ছোঁড়া কামানের গোলা বিদ্ধ থাকতে দেখেছি। উলমের যুদ্ধে সেটা ছোঁড়া হয়। চোখে দেখা উপলব্ধি এই কামানের গোলার মতই। এগুলো প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তারা মনে গেঁথে যায়। চিরকাল থেকেও যায়। বোনাপার্ট যেমন সব অষ্ট্রিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এগুলো সেইভাবেই বাকি সব বিরুদ্ধতা দূর করে দেয়।

টেকনিকাল কথা বাদ দেবেন

আপনি যদি কোন প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনিকাল কাজ করে থাকেন-বা আপনি যদি আইনবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আরও কোন কিছুর বিশেষজ্ঞ হন–তাহলে অত্যন্ত

সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে বক্তা হিসেবে। শ্রোতাদের কাছে কথা বলার সময় এসব খুঁটিনাটি আপনাকে বাদ দিতেই হবে।

আমার শিক্ষা সংক্রান্ত জীবনে আমি বহুবার দেখেছি শতশত বক্তৃতা উপযুক্ত মুহূর্তে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা বক্তৃতা দানের সময় শ্রোতাদের তার বিশেষজ্ঞতার ধারণা যে থাকতে পারে না সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এর ফল কি হয়? শ্রোতারা কোন আগ্রহই বোধ করেনি। এরকম ক্ষেত্রে বক্তার কি করা দরকার? তাকে ইণ্ডিয়ানরা সেনেটর রেভেবিজের এই লেখাটি পাঠ করে মনে রাখতে হবে :

'সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল শ্রোতাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান মনে হওয়া শ্রোতাটিকে বেছে নিয়ে তাকে আপনার বক্তৃতায় আগ্রহী করতে চাওয়া। এটা একমাত্র সম্ভব আপনার বক্তব্যকে সহজবোধ্য, স্পষ্ট করে তোলার মধ্য দিয়ে। ব্যাপারটা ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝানোর মত করেই বলা উচিত।'

একবার আমাদের ক্লাসে একজন ডাক্তার বলেন স্বাস্থ্য ভাল রাখার কাজে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলা কতখানি দরকার। বিষয়টা তিনি জটিল করে তোলেন ডাক্তারী শাস্ত্রের আর শারীর বিদ্যার নানা টেকনিকাল কথা জানিয়ে। তিনি যখন তাঁর বক্তব্যের পরবর্তী অধ্যায়ে যাচ্ছিলেন আমাদের একজন শিক্ষক তখন তাকে বাধা দিলেন। তিনি এবার শ্রোতাদের কাছে হাত তোলার আবেদন জানিয়ে বললেন কজন ডাক্তারের কথা বুঝেছেন। দেখা গেল প্রায় অধিকাংশ শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বোঝেনি।

এরপর ডাক্তার সহজ সরল ভাষায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের কাজটি বুঝিয়ে দিলেন।

এ ধরনের বক্তব্য রাখার সময় সবচেয়ে ভাল হলো সরল থেকে কঠিন পর্যায়ে ধাপে ধাপে পৌঁছান। যেমন ধরুন আপনি হয়তো রেফ্রিজারেটারের জমাট বাঁধা বরফের বিষয়ে বলতে চাইছেন। সেক্ষেত্র যদি টেকনিকাল খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আপনার কথা বলতে চান তাতে শ্রোতাদের আগ্রহ আদৌ জাগবে না।

অ্যারিস্টটল এই বিষয় সম্পর্কে একবার চমৎকার একটি উপদেশ দান করেন : জ্ঞানী মানুষের মত চিন্তা করুন, কথা বলুন সাধারণ মানুষের মত। কখনও বক্তব্যের মাঝখানে যদি টেকনিকাল বিষয় বলার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেটা আগে সহজবোধ করে বুঝিয়ে দিন।

আমি একবার কিছু গৃহকর্ত্রীর সামনে জনৈক ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞকে কথা বলতে দেখি। ভদ্রলোক অনায়াস ভঙ্গীতে সুন্দরভাবে ব্যাঙ্ক আমানতের বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

৫. দৃশ্যমান সূত্রের সাহায্য নিন

মানুষের চোখ থেকে যে সব স্নায়ু মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলে গেছে সেগুলো কানের স্নায়ুর চেয়ে আকারে ঢের বড়। বিজ্ঞান বলে আমরা চোখের বক্তব্য কানের বক্তব্যের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি আমল দিতে চাই।

জাপানী এক প্রবাদে আছে, 'একবার দেখা একশবার শোনার চেয়ে ভালো।'

তাই যদি পরিষ্কারভাবে বলতে চান তাহলে আপনার বক্তব্যকে স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং দৃশ্যমান করে তুলুন। ন্যাশনাল ক্যাশ রেজিস্টার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জন এইচ. প্যাটারসনের

নীতিও তাই ছিল। তিনি তাঁর কর্মচারিদের আর বিক্রেতাদের সামনে কথা বলার সময় বলেন :

'আমি দেখেছি মানুষ শুধু কথা বলার উপর নির্ভর করতে পারে না যাতে তার প্রতি মানুষের আগ্রহ জাগে। একটা নাটকীয় বাড়তি জিনিসও এজন্য চাই। তাই আমার মনে হয় ভাল ফল লাভ করার জন্য দরকার ছবি–যার সাহায্যে কোন বস্তুর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা যায়। ছবি আবার সাধারণ অঙ্কনের চেয়ে ভাল।

কখনও কোন সময় যদি এঁকে দেখানো প্রয়োজন হয় তাহলে যথাসম্ভব বড় করে তা আঁকবেন। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। একনাগাড়ে ছবি দেখানোও আবার বিরক্তিকর হয়। মনে রাখবেন শ্রোতারা পাকা আঁকিয়ের ছবি দেখতে আগ্রহ বোধ করে না। যদি কোন সময় ছবি এঁকে বা এনে দেখানো দরকার হয় তাহলে শ্রোতাদের আগ্রহ জানানোর জন্য নিচের পরামর্শ মেনে চলবেন :

১। দেখাবার প্রয়োজনীয় মুহূর্তের আগে পর্যন্ত ছবিগুলি আড়ালে রাখবেন।

২। বেশ বড় ছবি দেখাবেন, যাতে শেষ সারি থেকেও তা দেখতে পাওয়া যায়। মনে রাখবেন শ্রোতারা ছবিটা না দেখতে পেলে বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবে না।

৩। কথা বলার সময় কোন ছবি শ্রোতাদের হাতে দেবেন না।

৪। কোন ছবি দেখাতে হলে হাতে নিয়ে উঁচু করেই তা দেখাবেন যাতে শ্রোতারা দেখতে পায়।

৫। মনে রাখবেন যে জিনিস নড়তে পারে না এবং যা পারে তার চেয়ে দশগুণ বেশি কার্যকর। সম্ভব হলে তার ব্যবস্থা করবেন।

৬। কথা বলার সময় দ্রষ্টব্য নির্ণয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না–কারণ আমি শ্রোতাদের বোঝাতে চাইছেন।

৭। দেখানো হয়ে গেলে দ্রষ্টব্যটি সরিয়ে নিন।

৮। দ্রষ্টব্যটি টেবিলের উপরে রেখে আস্তে আস্তে তার ব্যাখ্যা করবেন–তাহলেই শ্রোতাদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারবেন

দৃশ্যমান বস্তু আজকাল সহজবোধ্যভাবে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যবহার হতে শুরু করেছে। আপনি যা বলতে চান তা বোঝাবার ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই।

কথা বার্তায় অভিজ্ঞ দুজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে পরিষ্কারভাবে কথা বা বক্তব্য বুঝিয়ে বলার দক্ষতা জন্মায় কেবল ভাল রকম শিক্ষা আর নিয়মানুবর্তিতার উপর। লিঙ্কন যেমন বলেছিলেন স্পস্ট বলার জন্য আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা দরকার। নক্স কলেজের প্রেসিডেন্ট ডঃ গ্যালিভারকে তিনি একবার বলেছিলেন অল্প বয়সে তিনি কিভাবে এই আগ্রহ গড়ে তোলেন :

'ছোট বেলার যে স্মৃতি আমার মনে পড়ে তার মধ্যে রয়েছে কেউ আমায় কোন কথা বললে তা যদি বুঝতে না পারতাম তাহলে ভয়ানক রাগ হত। আমার মনে হয় না আর কোন ব্যাপারেই আমার রাগ হত। এটা তখন থেকেই আমার মেজাজ খারাপ করে দিত, তা আজও সেইভাবেই আছে। আমার মনে পড়ছে আমার ছোট্ট ঘরে গিয়ে অনবরত রাত্রিতে পায়চারি করতে করতে পড়শীদের বলা কিছু কথাবার্তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করতাম। যতক্ষণ না কথাগুলো স্পষ্ট কোন অর্থ উপলব্ধি করতাম ততক্ষণ আমার স্বস্তি ছিল না।এ ব্যাপারটা তখন থেকেই আমার বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে, আজও তার পরিবর্তন ঘটেনি।

একজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনও এসম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন। সেটা এই রকম :

'আমার বাবা ছিলেন একজন অতিমাত্রায় বুদ্ধিজীবি মানুষ। আমার সেরা শিক্ষালাভ হয় তাঁরই কাছে। বাবা কোন সময়েই অস্পষ্ট অগোছালো কথা সহ্য করতে পারতেন না। গোড়া থেকে শুরু করে তাঁর একাশি বছর বয়সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৪৩ পর্যন্ত) আমি যাই শিখতাম তার কাছে নিয়ে যেতাম।

আমি যা লিখতাম তিনি সবই চেঁচিয়ে পড়তে বলতেন, ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কষ্টকর হত। পড়ার ফাঁকে তিনি মাঝে মাঝেই থামিয়ে দিয়ে বলতেন, 'যে কথা লিখেছ তার মানে কি?' আমি তাঁকে সেটা বুঝিয়ে বলতাম আর দেখতাম লেখার চেয়ে বলাই ভালো হয়েছে। লেখায় এভাবে বলোনি কেন? বাবা শুনে বলতেন, 'কোন পাখি মারার

জন্য সারা এলাকা জুড়ে গুলি চালাবে না, বরং রাইফেল দিয়ে নির্দিষ্ট পাখিকেই মারতে চেষ্টা করবে।’

৮. বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা

একবার একদল স্ত্রী পুরুষ ভয়ঙ্কর এক ঝড়ের তাণ্ডবের সামনে পড়েছিলেন। অবশ্য সত্যিকার ঝড় নয়, তবে তার চেয়েও বোধ হয় বেশি। আসলে তারা মরিস গোল্ডস্ল্যাট নামে একজন মানুষ ঝড়ের মুখে পড়ে যান। ওই দলের একজন এইভাবে ঘটনাটি বর্ণনা দিয়েছিলেন :

‘আমরা শিকাগোয় এক মধ্যাহ্নভোজের টেবিলের চারপাশে বসেছিলাম। যে ভদ্রলোকের কথা বলছি তাকে আমরা বিখ্যাত একজন বক্তা বলেই জানতাম। কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আমরা তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালাম।

‘তিনি বেশ শান্তভাবেই আরম্ভ করলেন–মধ্যবয়স্ক লোকটি, আচার আচরণ চমৎকার। তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তিনি জানালেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান আর আমরা বিরক্ত বোধ করলে যেন তাকে মার্জনা করি।

‘তারপরেই এক ঝড়ের মতই তিনি আক্রমণ করলেন। সামনে ঝুঁকে তিনি শান্ত কণ্ঠেই যখন কথাটা বললেন মনে হল যেন একটা কামানের গোলা ফাটল।

‘চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখুন, তিনি বললেন। পরস্পরের দিকে তাকান। আপনাদের কি জানা আছে আপনাদের মধ্যে কতজন ক্যান্সারে মারা যাবেন? আপনাদের প্রতি চারজনের মধ্যে একজন, যাদের বয়স পঁয়তাল্লিশের উপর। মনে রাখবেন প্রতি চারজনে একজন।

‘একটু থামলেন তিনি আর তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর তিনি বললেন, এটা নিছক নিষ্ঠুর সত্য, তবে বেশিদিন এমন থাকবে না এবং এসম্পর্কে কিছু করা যাবে। এই ধরণের কিছু ব্যাপারটা হল ক্যান্সারের চিকিৎসায় অগ্রগতি আর এর কারণ অনুসন্ধান।

তিনি টেবিলের চারদিকে আমাদের দিকে তাকলেন। আপনারা কি এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে চান? তিনি প্রশ্ন করলেন।

‘হ্যাঁ’ ছাড়া আর কি কোন উত্তর হয়? আমি আর বাকি সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, হ্যাঁ!

এক মিনিটের অবকাশেই মরিস গোল্ডস্ল্যাট আমাদের জয় করে ফেললেন। তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে আমাদের টেনে নিলেন। তিনি সমাজ সেবার জন্য যা করতে চাইছিলেন তাতে তাঁর পাশে আমাদেরও দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করলেন।

সর্বত্রই শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আশা করা যে কোন বক্তারই মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। যেমন মিঃ গোল্ডব্ল্যাটও নাটকীয়ভাবে সুন্দর কারণ দেখিয়ে আমাদের মন জয় করলেন। তিনি এবং তার ভাই নাথান প্রায় কিছু হাতে না নিয়েই একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের শৃঙখল খুলে বছরে প্রায় ১০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসা করে চলেছেন। কল্পনাতীত সাফল্যই তাঁরা পান কিন্তু নাথান অসুস্থ থাকায় অল্পদিন পরেই ক্যান্সারে মারা যায়। তারপর মরিস গোল্ডস্ল্যাট, গোল্ডস্ল্যাট ফাউণ্ডেশানের পক্ষে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সার গবেষণার জন্য দশলক্ষ ডলার দান করার ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে মরিস

গোল্ডব্ল্যাট ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে জনসাধারণের সুবিধার্থে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য তার সারা জীবন উৎসর্গ করেন।

এইসব ঘটনা মরিস গোল্ডব্ল্যাটের ব্যক্তিত্বই আমাদের জয় করল। ঐকান্তিকতা, আগ্রহ, উৎসাহ-এই তিনটির সমন্বয়ে তিনি মুহূর্তেই আমাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন, তাঁর বন্ধুত্বলাভ করে আমরাও ধন্য। এসবই তাঁকে মধুরতম করেছিল একজন ভাল বক্তা হওয়ার গুণে।

১. যোগ্যতা দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করুন

কুইন্টিলিয়ান একজন বক্তাকে আখ্যা দেন এইভাবে কথা বলায় দক্ষ একজন ভালো মানুষ। একাগ্রতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে তিনি এটা বলেছিলেন। এ বইয়ে যাই বলা হোক বা নাই বলা হোক এর চেয়ে ভালো বিশ্লেষণ, বক্তা সম্পর্কে আর হয় না। পিয়েরপন্ট মর্গ্যান বলেছেন প্রশংসা আদায় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল চরিত্র। আর শ্রোতাদের বিশ্বাস অর্জন করার ব্যাপারেও এ কার্যকরী হয়।

আলেকজাণ্ডার উলকট বলেছিলেন, কোন মানুষ যখন আন্তরিকভাবে কথা বলেন তখন তার কথায় যে রঙ ফোটে তা কোন যাদুকর ও দেখাতে পারে না।

আসলে আমাদের বক্তব্যের যখন উদ্দেশ্য হয় বিশ্বাস জন্মানো, তখন দরকার হয় আমাদের অন্তর নিঃসৃত বিশ্বাসকে কথার মধ্য দিয়ে আন্তরিকতায় মেলে ধরা। অপরকে বিশ্বাস অর্জন করাতে হলে নিজেদের প্রথমেই নিশ্চিত হতে হয়।

২. শ্রোতাদের ‘হ্যাঁ’ বলতে চেষ্টা করুন

নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার ডিল স্কট বলেছেন যে, ‘মনের মধ্যে যে প্রতিটি ধারণা ও আদর্শ বা উপসংহারের অস্তিত্ব থাকে তা সত্য, আর তা বাধাপ্রাপ্ত হয় শুধুমাত্র কোন বিরোধী ধারণা জেগে উঠলে তবেই।’

এরকম করতে সক্ষম হলে শ্রোতাদের ‘হ্যাঁ’ বলানো বেশ সহজও হয়ে ওঠে। নিউ ইয়র্কের এক স্কুলে এ ব্যাপারে মনস্তত্বের দিক থেকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন আমার বিশেষ বন্ধু হ্যাঁরী ওভারস্ট্রিট। তিনি বলেন :

‘একজন দক্ষ বক্তা যদি কোন ভাবে শ্রোতাদের হ্যাঁ এই ভাবটুকু আদায় করতে পারেন তাহলে তিনি শ্রোতাদের মনস্তাত্ত্বিক অগ্রসর হওয়ার মধ্যে সাড়া জাগাতে পারেন। এ অনেকটা কোন বিলিয়ার্ড খেলার বলের নড়াচড়ার মতোই। এই বিলিয়ার্ড বলকে ঠেলে দিন দেখবেন এটাকে ঠেলতে বেশ শক্তি লাগছে। উল্টো পথে পাঠানোর জন্য দরকার বেশি শক্তি।

এ ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটি বেশ পরিষ্কারই বলা যায়। যখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে না আর বেশি জোরের সঙ্গেই তা বলে, তখন মাত্র ওই একটা কথাই সে বলে না। তার সমস্ত দেহতন্তু, স্নায়ু, পেশী একসঙ্গে মিলেই যেন প্রতিবাদে মুখর হতে চায়। অন্যদিকে যখন ‘হ্যাঁ’ জবাব আসে তখন প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের অবকাশ না থাকায় দেহের সমস্ত সত্তাই এগিয়ে আসে এবং তা সবকিছু তৎপর হতে চায়। এই

জন্যই বলতে চাই আমরা যতখানি বেশি করে 'হ্যাঁ' ভাবটি জাগিয়ে তুলতে পারব ততই সহজে শ্রোতাদের মন জয় করে নিতেও পারব।

এই শ্রোতাদের দিয়ে 'হ্যাঁ' বলানো কাজটি অতি সহজেই বলা যায়। অথচ আশ্চর্যের কথা এই ব্যাপারটি কিভাবে সকলে অবহেলা করতে চান। প্রায়ই দেখা যায় বক্তা শ্রোতাদের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে যেয়ে প্রথমেই তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এতে কি ভালো ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারব? বক্তা যদি একটু আনন্দের উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম করতে চান, তাহলে তাকে ক্ষমা করা চলতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি সেটা করেছেন, তাহলে তাকে মনস্তাত্বিক দিক থেকে মূর্খই বলতে হয়।

কোন ছাত্রকে গোড়াতেই একবার কোন বিষয়ে 'না' বলতে দিয়ে দেখুন-শুধু ছাত্র নয়, কোন ক্রেতা, শিশু, স্বামী বা স্ত্রীকেও না বলতে দিন; এবার দেখবেন তাদের কাউকেই 'হ্যাঁ' বলাতে গেলে কি ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আপনার সমস্ত প্রাণপাত চেষ্টাই বিফল হবে।

তাহলে গোড়াতেই এই 'হ্যাঁ' সাড়া পাওয়ার পথ কিভাবে পাওয়া যাবে? খুব সহজে। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন একবার এ সম্বন্ধে বলেন, কোন বিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্যে প্রথমেই আমার চেষ্টা থাকতো উভয়ের মধ্যে কোথায় মিল আছে খুঁজে বের করতে। লিঙ্কন এই কৌশল খাঁটিয়েছিরেন সবচেয়ে স্পর্শকাতর সেই বিষয় সম্বন্ধেও-অর্থাৎ দাসপ্রথার অবলোপ। দি মিরর নামে নিরপেক্ষ এক সংবাদপত্র তাঁর কোন এক বক্তৃতার উল্লেখ করতে গিয়ে বলে, তার বিরোধীরা প্রথম আধ ঘন্টায় তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে

একমত হন। সেই অবস্থা থেকেই তিনি তাদের একটু একটু করে বিপরীত পথে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেন যতক্ষণ না মনে হয় তিনি সব বিরোধীদের একেবারেই বিপরীত বিন্দুতে এনে ফেলেছেন।'

এতে কি বুঝতে পারছেন না যে বক্তা তার শ্রোতাদের সঙ্গে গোড়া থেকেই তর্কে নেমে পড়েন, আসলে তিনি এতে তাদের জেদ আর বিরোধীতাই জাগিয়ে তোলার কাজটি করে ফেলেন। তারা সাবধান হয়ে যায়-আর তখন তাদের মন ঘোরানোর কোন কাজই সমাধা হতে পারে না। সে সময় একথা বলে লাভ হবে, আমি অমুক অমুক প্রমান করে দেব?' তাতে কি আপনার শ্রোতারা মুচকি হেসে মনে মনে বলবেন না; দেখা যাক করুন তো একবার, দেখি?

তাহলে কি আপনি যদি শ্রোতা আর বক্তা দুপক্ষই যা বিশ্বাস করেন সেরকম কিছু বলে শুরু করলে ভাল করবেন না? তারপর এমন কিছু যোগ্য প্রশ্ন রাখবেন যা শ্রোতারা উত্তর দিতে তৈরি? এবার শ্রোতাদের এমনভাবে আগ্রহী করে তোলা চাই যাতে তারা আপনার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে তৈরি হয়। মনে রাখবেন সবচেয়ে ভালো বিতর্ক হল যাকে সরল কোন ব্যাখ্যা বলে মনে হয়।

.

একথা মনে রাখলে ভাল করবেন, প্রত্যেক বিতর্কিত বিষয়ে, তা সে যতই বিরাট আর তিক্ত মনে হোক, বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের কোথাও খানিকটা মিল থাকবেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : ১৯৬০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড

ম্যাকমিলান দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সংসদের উভয় সভায় কিছু বক্তৃতা দেন। তিনি সে সময় গ্রেট ব্রিটেনের বর্ণ বৈষম্য সংক্রান্ত নীতি ব্যাখ্য করেন। ওই সময় আবার দক্ষিণ-আফ্রিকায় ওই বর্ণ বৈষম্য নীতি পুরোপুরি বজায় ছিল। তিনি কি গোড়াতেই তার বিপরীত মত দিয়ে বক্তব্য আরম্ভ করেছিলেন? না। তিনি আরম্ভ করেন দক্ষিণ-আফ্রিকার চমৎকার অর্থনেতিক উন্নতি আর দুনিয়ার প্রতি সে দেশের দান সম্বন্ধে আলোচনা করে। তারপর বেশ কৌশল আর দক্ষতায় তিনি মত পার্থক্যের বিষয়ে অবতারণা করেন। এক্ষেত্রেও তিনি জানান তিনি জানেন এই মত পার্থক্যের যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কারণ আছে। তাঁর সমস্ত বক্তৃতাই বেশ বিদগ্ধ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল। এতে মিশে ছিল লিঙ্কনের মতই দৃঢ়তাময় বক্তব্য। কমনওয়েলথের সদস্য এক রাষ্ট্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটাই আমাদের ইচ্ছা ও আগ্রহ যে তাদের সবরকম সহায়তা দান করা হোক, কিন্তু আমার আশা আমার এ কথায় আপনারা ত্রুটি ধরবেন না যে আপনাদের নীতির সঙ্গে, যে নীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি তার একটি মূলগত প্রভেদ গড়ে উঠেছে। আমার মনে হয় বন্ধুর মতই আমরা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারব যে আজ আমাদের মাঝখানে এমন নীতি পড়ে রয়েছে যা সারা বিশ্ব মেনে নিতে অনিচ্ছুক।

এতেই বোঝা যাচ্ছে শ্রোতারা গ্রহণ করতে যতই অনিচ্ছুক থাকুক এমন বক্তব্য রাখলে তাদের তা না মেনে গত্যন্তর থাকে না। একবার ভাবুন, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান গোড়াতেই মত পার্থক্য নিয়ে বলতে শুরু করলে তার পরিণতি কি হতে পারত?

প্রফেসার জেমস্ হার্ভে রবিনসন তার মাইও ইন দি মেকিং' গ্রন্থে বলেছেন, মাঝে মাঝে কোন বাধা ছাড়াই আমাদের মন পরিবর্তন করি বা আবেগ বদলাই। কিন্তু কেউ যদি জানায় কোথাও আমরা ভুল করেছি আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তা অগ্রাহ্য করতে তৈরি হই

আর আমাদের মন কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের মনে কোন বিশ্বাস গড়ে ওঠার ব্যাপারে আমরা অবিশ্বাস্য রকম খেয়ালশূন্য, অথচ মনে গড়ে ওঠা কোন বিশ্বাসের কেউ সমালোচনা করলে আমাদের তা আঁকড়ে থাকার অদ্ভুত রকম বাসনা জেগে ওঠে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রিয়ময় আদৌ যা প্রিয় তা হল আত্মগর্ব ...। আমরা যা বিশ্বাস করে আসি তাই মেনে চলতে চাই। এর ফল হল আমাদের যুক্তি কেবল সেটাই আঁকড়ে থাকতে প্রেরণা যোগায়।

৩. শ্রোতাদের উৎসাহিত করুন

কোন বক্তা যখন আবেগ আর উৎসাহ নিয়ে কোন বক্তব্য রাখার ভাবটি প্রকাশ করেন তখন মতপার্থক্য থাকলেও শ্রোতাদের মধ্যে প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে না। এক্ষেত্রে 'ছোঁয়াচে' কথাটা ব্যবহার করছি–তার মানে হল এমনভাবে বক্তব্য রাখতে হবে যাতে শ্রোতারা তাৎক্ষণিক ভাবেই উৎসাহিত হতে পারে। আর এই উৎসাহ সৃষ্টি করতে হলে চাই সত্যিকার আন্তরিকতা। এক্ষেত্রে বক্তা যেভাবেই শুরু করুন না কেন। তার বাগবিন্যাস যেমনই হোক, তাতে অলঙ্কার বা অনুপ্রাস থাকুক চাই না থাকুক–প্রথম যা থাকা দরকার তা হল আবেগ আর বিশ্বাস। আপনার দৃষ্টি, অঙ্গ-ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর সবকিছুর মধ্যেই প্রকাশ পাবে ওই আন্তরিকতা আর উৎসাহের আবেগ। শ্রোতারা এতে মুগ্ধ হবেই।

আপনি যখনই কোন জনসংযোগের কাজে নামবেন, বিশেষ করে শ্রোতাদের বিশ্বাস জন্মানোই যখন আপনার কাজ; তখন শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য রাখতেই হবে। আপনি যদি সাধারণ হন, শ্রোতারাও তাই হবে।

আমাকে একবার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পদক বিতরণ উৎসবে তিনজনের বিচারক মণ্ডলীর একজন হিসেবে ডাকা হয়। গ্রহীতাদের মধ্যে ছিল প্রায় আধ ডজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। সকলেই শিক্ষিত আর পদকটি পাওয়ার জন্য আগ্রহী। কিন্তু তবু তাদের মধ্যে একটা জিনিসের অভাব ছিল–তারা বিশ্বাস জন্মানোর জন্য আগ্রহী ছিল না, তাদের একটাই আগ্রহ–যে কোন ভাবে পদকটি লাভ করা।

ছাত্ররা বক্তৃতার বিষয় ঠিক করেও রেখেছিল। অথচ বিষয় সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস জন্মানো নিয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। নিজেদের যুক্তিকে দৃঢ় করতে তাদের আকাঙক্ষারও অভাব ছিল। তাদের বক্তৃতাটা নিছক বক্তৃতাই হয়ে উঠেছিল।

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল একজন জুলু রাজপুত্র। সে তার বক্তব্যের বিষয় ঠিক করে আধুনিক সভ্যতায় আফ্রিকার দান'। কথা বলার সময় আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বক্তব্য রাখতে থাকে। তার প্রতিটি কথার পিছনে ছিল জ্বালাময়ী আবেগের স্পর্শ। শুধু শেখা কোন বক্তৃতা নয়-তার কথাগুলো হয়ে ওঠে সজীবতায় ভরা, আবেগ আর আন্তরিকা নিজের দৃঢ় বিশ্বাস মতই সে শ্রোতাদের নিজের কথা শোনাতে চায়–তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়।

আমরা তাকেই পদকটি দিই, যদিও বক্তা হিসেবে সে হয়তো অন্যদের সমকক্ষ ছিল না। আমরা বিচারকরা তবুও তাকে পদকটি দিলাম এই কারণেই যে তার মধ্যে ছিল সত্যিকার আন্তরিকতা, সদিচ্ছা–তার প্রতিটি কথাই ছিল সত্যদর্শী। সেখানে বাকিদের বক্তব্য ছিল সাদামাটা।

রাজপুত্রটি অনেক দূরের এক দেশে শিখেছে যে একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে কোন বক্তব্য গ্রহণীয় হয়, হয় না যুক্তি দিয়েও। আপনাকে বোঝাতে হবে নিজের বক্তব্যকে কতখানি বিশ্বাস করেন।

৪. শ্রোতাদের প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধা দেখান

'মানুষের ব্যক্তিসত্তা চায় ভালবাসা আর তাছাড়াও সম্মান', বলেছিলেন ড. নরম্যান ভিনসেন্ট পীল। প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজের সম্পর্কে ধারণা, আত্মসম্মান আর গুরুত্ববোধ থাকে। সেই মানুষটির ওই ধারণায় একবার আঘাত করুন, দেখবেন চিরকালের মতই তাকে হারিয়েছেন। তাই যখনই কোন লোককে ভালবেসে শ্রদ্ধা জানাবেন, মনে রাখবেন সেও আপনাকে ততখানি ভালবাসবে আর শ্রদ্ধা জানাতে চাইবে।

'আমি একবার কোন অনুষ্ঠানে একজন কমেডিয়ানের সঙ্গে ছিলাম। লোকটিকে তেমন ভাল করে জানতাম না। সেই সাক্ষাৎকারের সময় যখন জানতে পারলাম তিনি তার কাজে বেশ অসুবিধা বোধ করছেন, তখনই বুঝলাম কেন।

'আমি তার পাশে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।''আপনি ভয় পাচ্ছেন না? তিনি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, আমি জবাবে বললাম। শ্রোতাদের সামনে কথা বলতে আমি সব সময় একটু নার্ভাস বোধ করি। শ্রোতাদের সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা, তাই দায়িত্বের কথাটা ভাবলেই একটু ভয় লাগে। আপনি নার্ভাস হন না?'

'না', তিনি বললেন, 'ভয় পাব কেন? শ্রোতাদের কাছে ভয় কি? তাদের সহজেই বাগানো যায়।

'আপনার সঙ্গে আমি একমত নই, আমি বললাম। শ্রোতারাই আপনার আসল বিচারক। তাদের প্রতি আমার অপার শ্রদ্ধা আছে।

ডঃ পীল যখন ওই ভদ্রলোকের জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমে আসার কথা শুনলেন তিনি বুঝলেন এর কারণ রয়ে গেছিল ভদ্রলোকের শ্রোতাদের প্রতি ব্যবহারের মধ্যে। তিনি এতে অপরের অশ্রদ্ধাই জাগিয়ে তুলেছিলেন তাদের জয় করতে না চেয়ে। আমাদের মত যারা অন্যকে কিছু দিতে চায় তাদের কাছে এটা একটা মস্ত শিক্ষার বিষয়।

৫. বন্ধুত্বপূর্ণভাবে শুরু করুন

একবার এক নাস্তিক উইলিয়াম পেলীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ভগবান বলে কিছু নেই সে কথা অপ্রমাণ করতে। খুব শান্তভাবেই পেলী তার ঘড়িটা বের করলেন : আপনাদের যদি বলি ঘড়ির এই সব লিভার আর স্প্রিং নিজেরাই নিজেদের তৈরী করে চলতে আরম্ভ করেছে, তাহলে কি আপনি আমার বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না? অবশ্যই তা করবেন। একবার আকাশের তারাদের লক্ষ্য করুন। এদের প্রতিটিরই নিখুঁত গতিপথ আর গতিবেগ আছে-সূর্যের চারপাশের গ্রহমণ্ডল আর পৃথিবীর-এরা লক্ষ লক্ষ মাইল গতিতে যথানিয়মে পরিকল্পনা করে চলেছে। প্রত্যেক তারাই এক একটি সূর্য, আর তাদের নিজস্ব উপগ্রহও আছে, ঠিক আমাদের সৌরজগতের মত। অথচ কোন সংঘর্ষ নেই। কোন

গণ্ডগোল নেই, কোন ভুল নেই। সবই শান্ত, নিখুঁত আর নিয়ন্ত্রিত। তাই এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে এসবই আপনা থেকেই হয় না কি অন্য কেউ তা নিয়ন্ত্রণ করে?

ধরুন উনি এভাবে কথা না বলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথমেই বলে উঠতেন : ভগবান নেই? বোকার মত কথা বলবেন না কি বলছেন তা জানেন না।' একথা বললে কি ঘটত? সন্দেহ নেই বেশ তর্কাতর্কি লেগে যেত-যেরকম কথা কাটাকাটি হত তাতে শেষ পর্যন্ত ফল কিছুই হত না। নাস্তিক ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গরম হয়ে বুনো বিড়ালের মত ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কেন? কারণ তাঁর সযতে গড়ে তোলা মতটা যে চুরমার হয়ে যেতে বসেছে, তার অহঙ্কার নষ্ট হতে চলেছে।

মানুষের চরিত্রে এই অহমিকা একেবারে মৌলিক এক বৈশিষ্ট্য। তাহলে ওই বৈশিষ্ট্যকে আমাদের মতের বিরুদ্ধে গড়ে উঠতে না দিয়ে তাকে আমাদের সপক্ষে লাগাই না কেন? কিন্তু তা করব কিভাবে? ঠিক পেলী যা করেছিলেন সেইভাবে কথা বলে-অর্থাৎ আমাদের প্রতিপক্ষ যা বিশ্বাস করে তাই বলে। এর ফলে সে আপনার কথা বাতিল না করে বরং গ্রহণ করবে। এতে সংঘর্ষের পথ এড়ানো যায়।

পেলী দেখাতে চেয়েছিলেন মানুষের মন কীভাবে কাজ করে আর প্রশংসা কিভাবে গ্রহণ করে। বেশির ভাগ মানুষই কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা মেনে চলেন না। তাদের ধারণা আক্রমণ করেই বোধ হয় অপরকে চট করে আয়ত্তে আনা যায়। এর ফলে কি ঘটে? খুবই সহজ ব্যাপার-যেই মাত্র মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে, মনের সমস্ত দরজা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আর কথার লড়াই এবং মতপার্থক্য জন্ম নেয়। দুপক্ষের কেউই আর পরাজয় মানতে চায় না।

আমি এখানে যে মানার মত নিয়মের কথা বলতে চাই তা কিন্তু মোটেই নতুন নয়। বহুঁকাল আগেই এটি সেন্ট পল কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তিনি এটা কাজে লাগান মার্শ হিলে এথেন্সবাসীদের কাছে তাঁর বিখ্যাত ভাষণে–তাঁর সেই ভাষণ এমন চমৎকার আর পরচিত্তজয়ী ছিল যে আজও প্রায় উনিশ শতক পরেও আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁর শিক্ষা ছিল পুর্ণতাময়, খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কৃতিত্বই তাঁর প্রধান সহায় হয়ে ওঠে। একদিন তিনি এথেন্সে উপস্থিত হলেন–পেরিক্লিসের পরবর্তীকালের এথেন্স, যে এথেন্স একদিন গৌরবের শিখরে উঠেছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তার পতন ঘটে চলেছিল। ওই সময় সম্বন্ধে বাইবেলে বলা হয়েছে : সমস্ত এথেন্সবাসী আর বিদেশীরা, যারা ওখানেই থাকতেন প্রতিদিনই নতুন কিছু বলতেন বা শুনতেন।

সে সময় এথেন্সে রেডিও, টেলিগ্রাফ বা ডাক ব্যবস্থা ছিল না অথচ এথেন্সবাসীরা প্রত্যেকদিন বিকেলেই নতুন খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারত। তারপরেই সেন্ট পল হাজির হলেন। এটাও নতুন ঘটনা। তারা সবাই বেশ খুশী মনে, আনন্দেই তাঁকে আগ্রহ নিয়ে ঘিরে ধরল। তাকে এরোপাগানে নিয়ে গিয়ে তারা বলল : আপনার ওই নতুন চিন্তাধারা জিনিসটি একবার শুনতে পারি কি, যার কথা বলছেন? কারণ আমাদের কানে আপনি নতুন কথা ঢুকিয়েছেন, তাই আমরা এর অর্থ জানতে চাই।

অর্থাৎ বলতে পারা যায় তারা একটা বক্তৃতাই শুনতে চেয়েছিল। আসলে সেন্ট পলও তাই ওখানে যান। খুব সম্ভব তিনি একটা পাথরের খণ্ডের দাঁড়িয়ে গোড়ায় একটু নার্ভাস হয়েই হাত কচলিয়ে, গলা সাফ করে বলতে আরম্ভ করেন। সবাই যা করে থাকে।

অবশ্য তিনি তাদের আমন্ত্রণের পদ্ধতিটা মোটেই জানতে পারেন নি। সেটা এই : নতুন মতবাদ ... অদ্ভুত জিনিস মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে একেবারে বিষাক্ত বস্তু। প্রথমে তাকে এই মনোভাব তাদের মন থেকে দূর করতেই হবে। এটা থেকে গেলে পরস্পরবিরোধী ভাব বাড়তেই থাকবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তিনি কিছুতেই সেরকম হতে দিতে পারবেন না। অতএব বেশ কৌশলে তাঁর শ্রোতারা যা ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করে সে কথা দিয়েই শুরু করতে হবে। এতে মতবিরোধ কমতে থাকবে। কিন্তু আরম্ভ করা যায় কিভাবে? এক মুহূর্ত ভাবলেন সেন্ট পল, তারপরেই তাঁর মাথায় চমৎকার একটা মতলব জেগে উঠতেই তিনি তাঁর অমর বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন "হে এথেন্সবাসীগণ, আমার মনে হয় আপনারা কুসংস্কারপ্রিয়।"

কোন কোন অনুবাদে আছে, আপনারা অত্যন্ত ধার্মিক। আমার মনে হয় এই কথাটাই ঠিক। তারা বহু দেবতার পূজা করত, অত্যন্ত ধার্মিকও ছিল। এটা করে তারা বেশ গর্বও করত। সেন্টপল তাদের প্রশংসা করায় তারা খুবই খুশি হল। তারা একটু একটু করে তার উপর খুশি হতে আরম্ভ করল। জনসংযোগের কাজে একটা নীতি হল কোন উদাহরণ দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করা। তিনি ঠিক তাই করলেন :

'এখানে আসার সময় আপনাদের ভক্তির প্রমাণ পেয়েছি, একটা দেবীও দেখেছি, তাতে আছে : 'অপরিচিত ঈশ্বরকে।

এতেই প্রমাণ হয় তারা সত্যিই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। তারা কোন একজন দেবতাকে পাছে অসম্মান জানানো হয় ভেবে একটা বেদী বানিয়ে সকলের প্রতিই সম্মান জানাতে

চেয়েছিল। সেন্টপল তাই ওই দেবীর উল্লেখ করে জানান তিনি তাদের তোষামোদ করছেন না, তিনি যা বলছেন তা সত্যিকার দৃষ্টিতে দেখে নেওয়া প্রশংসার বাণী।

এবার সেন্টপলের ওই চমৎকার ভাবে শুরু করার কারণটাই বলছি : 'অজ্ঞাতসারে আপনারা যাকে পূজা করছেন তাকেই আপনাদের কাছে উন্মুক্ত করছি।'

'নতুন ধারণা ... অদ্ভুত কিছু?' কণামাত্রও না। সেন্ট পল সেখানে হাজির হয়ে শুধু ব্যাখ্য করতে চেয়েছিলেন তারা না জেনে যে ঈশ্বরের উপাসনা করছে তারই সম্পর্কে কিছু।

এরপর সেন্ট পল তাঁর যুক্তির নীতি আর ধারণা নিয়ে অনেক কথা বলে এথেন্সবাসীদের নিজস্ব গ্রীক কবিদের কিছু কবিতা ও আবৃত্তি করলেন-এতেই বাজীমাত করলেন। অনেকেই তাকে ব্যঙ্গ করলেও বাকিরা বলল, "আমরা আবার আপনার কথা শুনব।

অপরের মনে কিছু ঢোকাতে বা তাদের বিশ্বাস অর্জনে আমাদের সমস্যা হল এই; আমাদের ধারণাকে তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে কোনো রকমেই বিরোধী না জাগে। এমন ক্ষমতা যার থাকে তিনিই কথা বলায় দক্ষতা অর্জন করেন আর অপরকে প্রভাবিতও করতে পারেন।

আপনার জীবনের প্রায় প্রতিটি দিনেই আপনি নানা মানুষের সঙ্গে কথা বলে থাকেন যাদের সঙ্গে আপনার মতের মিল থাকে না। আপনি কি প্রায় সব সময়েই অন্যদের নিজের মতাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালাতে চান না? সে চেষ্টা নিশ্চয়ই আপনি চালান। বাড়িতে, অফিসে, সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে ইত্যাদি নানা জায়গায় চালান। এসব ক্ষেত্রে আপনার কৌশলকে কি বেশ খানিকটা উন্নত করা যায় না? কিভাবে তাহলে শুরু

করবেন? লিঙ্কনের দক্ষতা আর ম্যাকমিলানের মত কৌশলে? তাই যদি হয় তাহলে আপনি সত্যই বেশ বড় কুটনীতিক আর দূরদর্শী। এক্ষেত্রে উড্রো উইলসনের কথাগুলো মনে রাখা দরকার। সেকথাগুলো এই : আপনি যদি আমার কাছে এসে বলেন, "আসুন, আমরা একসঙ্গে বসে পরামর্শ করি–যদি আমাদের মতের অমিল থাকে, তাহলে, আসুন ভাবতে চেষ্টা করি এ অমিল কেন; এরকম হলে আমরা দেখব আমাদের মত বিরোধের সীমানা খুবই ছোট। আমাদের যদি একটু ধৈর্য থাকে আর সমাধানের ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরা অনায়াসেই একসঙ্গে চলতে পারব।

৯. তাৎক্ষণিক বক্তৃতা

খুব বেশিদিনের কথা নয়, একদল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আর সরকারী আমলা কোন এক ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশংসা করছিলেন। একের পর এক বক্তা গবেষণাগারে রসায়নবিদ আর গবেষকদের আশ্চর্যজনক কর্মধারার বর্ণনা করলেন। তারা শোনালেন গবেষকরা কিভাবে ছোঁয়াচে সব রোগের টীকা তৈরি করছেন, জীবানুর আক্রমণ-রোধে কিভাবে ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। তাদের পশু আর মানুষের উপর পরীক্ষা একেবারে নাটকীয়।

একজন সরকারী কর্মচারী রিসার্চ ডিরেক্টরকে বললেন আপনার লোকেরা সত্যিই যাদুকর। আপনি কিছু বলছেন না কেন।

'আমি একা কথা বলতে পারি, লোকজনের সামনে পারি না', ভদ্রলোক একটু দুঃখের সঙ্গেই বললেন।

কিছুক্ষণ পরে চেয়ারম্যান বলে উঠলেন, 'আমরা কিন্তু এখনও আমাদের রিসার্চ ডিরেক্টরের কাছ থেকে কিছু শুনিনি। তিনি বক্তৃতা দিতে চাইছেন না। ঠিক আছে, আমরা তার কাছ থেকে অন্ততঃ দু'চারটে কথা শুনতে চাই।'

ব্যাপারটা ডিরেক্টরের কাছে ফ্যাসাদের মত হয়ে উঠল। তিনি কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথা বললেন মাত্র। বেশি কথা বলতে না পারার জন্য তিনি ক্ষমা চইলেন– ব্যাস্, এইটুকুই তাঁর বক্তব্য ছিল।

অথচ নিজের কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষ একজন মানুষ। শুধু কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁর আদৌ যোগ্যতা ছিল না! এমন হওয়ার কোন কারণ অবশ্য থাকার কথা নয়। কি করে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিতে হয় তিনি শিখতে পারতেন। আমার ক্লাসের এমন কোন ছাত্রকে দেখিনি যার পক্ষে এটা শেখা কঠিন। প্রথমেই যা দরকার সেটা ওই ডিরেক্টর কাজে লাগান নি–নিজের পরাজিত মনোভাব জোর করেই দূর করা। কাজটা যতটা কঠিন মনে হোক, মনের জোরেই সে বাধা দূর করা উচিত। আসল প্রয়োজন সাহস।

আপনি হয়তো বলবেন, ‘আমার বক্তব্য যদি আগেই তৈরি করে রাখতাম তাহলে ভাল হত। কিন্তু আচমকা আমাকে কিছু বলতে ডাকা হলে মুখে কথা আসতে চায় না।’

নিজের চিন্তাকে গুছিয়ে নিয়ে হঠাৎ কোন বক্তব্য রাখা অত্যন্ত দরকার হতে পারে-আর সেটা দীর্ঘ পরিশ্রমে তৈরি লম্বা বক্তৃতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আজকের আধুনিককালে এধরণের তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রয়োজন অতি বেশি রকম। বিশেষ করে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তো বটেই। বিশেষত আজকের যুগের দ্রুত জীবন-যাত্রার মনকে গুছিয়ে নিয়ে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। আজকের শিল্পজগতে আর এমনকি সরকারী প্রশাসনেও সমস্ত প্রস্তাব একজন মানুষ গ্রহণ করে না, তা গ্রহণ করা হয় কোন সভায় আলোচনা করে। একজন হিসেবে অনেকের বক্তব্য থাকে, আর তাকে তা তাৎক্ষণিক ভাবেই জানাতে হয়। এখানেই তাৎক্ষণিক বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১. তাৎক্ষণিক বক্তৃতা অভ্যাস

মোটামুটি যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যার কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে, তিনিই চমৎকার কোন তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিতে পারেন। তাৎক্ষণিক বক্তৃতার অর্থ হল, না তৈরি করে কোন কথা বলা। দ্রুত কথা বলে যাওয়ার পদ্ধতি শেখার বেশ কিছু উপায় আছে। একটা পদ্ধতি হল বিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পীরা যা করেন সেই পদ্ধতি।

বেশ কয়েক বছর আগে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক আমেরিকান ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধে বর্ণনা করেন, তিনি চার্লি চ্যাপলিন আর মেরি পিকফোর্ড দু'বছর ধরে প্রত্যেক রাতে একটা খেলা খেলে যেতেন। ব্যাপারটা খেলার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা আসলে ছিল কথা বলার মত কঠিন শিল্প নিয়ে অনুশীলন করে যাওয়া। খেলাটা সম্বন্ধে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস এটাই লিখেছিলেন :

আমাদের প্রত্যেকে একটুকরো কাগজে যে কোন বিষয় লিখতাম। এরপর টুকরোগুলো ভাজ করে মিশিয়ে ফেলতাম। এরপর একজন একটা টুকরো তুলত। তারপরেই তাকে কাগজে লেখা ওই বিষয় নিয়ে ষাট সেকেণ্ড কথা বলতে হত। একই বিষয় আমরা দুবার লিখতাম না। এক রাত্তিরে আমাকে 'ল্যাম্পের ঢাকা নিয়ে বলতে হয়। একবার চেষ্টা করে দেখুন কেমন সহজ। আমি কোন রকমে উতরে যাই।'

'কিন্তু আসল ব্যাপার হল খেলাটা আরম্ভ করার পর থেকে আমাদের তিনজনেরই বেশ উন্নতি হয়েছে। নানারকম বিষয়ে আমরা অনেকের চেয়েই বেশি জানি। কিন্তু তার চেয়েও যা ভাল তা হল, আমরা যে কোন বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলার ক্ষমতা অর্জন করেছি। দাঁড়িয়ে কিভাবে চিন্তা করতে হয় আমরা শিখেছি।'

আমাদের পাঠক্রমের ক্লাসে সদস্যদের তাৎক্ষণিক কথা বলতে বলা হয়। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝেছি এই ধরণের অনুশীলনে দুটো ব্যাপার ঘটে : (১) এতে প্রমাণ হয় ক্লাসের সকলেই দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে পারে, আর (২) এই অভিজ্ঞতা তাদের তৈরি করা বক্তৃতা দানের সময় আত্মবিশ্বাস আর মজবুত মন গড়ে তোলার সহায়তা করে। তারা বোঝেন কোন অজ্ঞাত কারণে তৈরি করা ভাষণ যদি মনে পড়ে তাহলে তারা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়ে অবস্থা সামলাতে পারবেন।

আমাদের ক্লাসে তাই কোন না কোন সময়ে তাৎক্ষণিক বক্তব্য রাখতে বলা হয়। তাতে কি হয়? দেখা যায় হয়তো কোন এ্যাকউন্ট্যান্টকে বিজ্ঞাপন নিয়ে বলতে বলা হল। বিজ্ঞাপন বিক্রেতাকে বলা হয় কিণ্ডারগার্টেন নিয়ে কথা বলতে, বা কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকে বলতে বলা হল কিণ্ডারগার্টেন নিয়ে কথা বলতে, বা কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকে বলতে বলা হল শিক্ষা সম্পর্কে।

তারা কি মাথা নিচু করে থাকবেন। মোটেই না। যদিও বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁর বিশেষজ্ঞ নন, তবুও তাদের জানা তথ্যটুকুই তাঁরা কেবল গুছিয়ে বলার চেষ্টা করবেন। হয়তো কারও কাছে কাজটা কঠিন, আবার কারও কাছে সহজ। আসলে এতে বেশ একটু মজা থাকে। তারা বোঝেন যে বিষয়ে তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই সে বিষয়েও তাঁদের কথা বলার ক্ষমতা জন্মেছে।

আমার বিশ্বাস আছে তারা যদি এই কাজ পারেন তাহলে যে কেউই তা পারবে–এটা করা সম্ভব ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাস দিয়ে। কেউ চেষ্টা করলেই তা পারবে।

আর একটা পদ্ধতি হল জোড়া লাগানো পদ্ধতি। ব্যাপারটা আমাদের পাঠ্যক্রমের ক্লাসে শেখানো হয়। বেশ সজীব এই পদ্ধতি। ক্লাসের একজন সভ্যকে যে কোন কাহিনী যতটা সম্ভব অদ্ভুতভাবে ঝকমকে করে বলতে বলা হয়। ধরা গেল তিনি বললেন, “আমি সেদিন যখন একটা হেলিকপ্টার চালিয়ে উড়ছিলাম তখন অবাক হয়ে দেখলাম এক ঝাঁক ‘উড়ন্ত চাকি আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি নামতে শুরু করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি উড়ন্ত চাকি থেকে একজন ক্ষুদে মানুষ গুলি চালাতে আরম্ভ করল। আমি ....।

ঠিক তখনই একটা ঘন্টা বেজে ওঠে কারণ বক্তার সময় ততক্ষণে শেষ হয়েছে। এবার পরবর্তী বক্তাকে ওই গল্পের জের টেনে যেতে হবে। ক্লাসের সকলে এক এক করে তাদের পালা কাহিনী বলে গেলে এর শেষ হবে হয়তো মঙ্গলগ্রহের কোনো খাল বা কংগ্রেসের হল ঘরে।

আগে থেকে প্রস্তুতি না নিয়ে এই ধরনের কথা বলে যাওয়ার কৌশল শিক্ষা দারুণ শিক্ষণীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতি যত বেশি করে অনুশীলন করা যায় ততই দক্ষতা বাড়তে থাকে। আর তার ফলে যে কেউ ব্যবসা বাণিজ্য, বিক্রয়, সামাজিক মেলামেশা, সভা সমিতি সর্বত্রই সফলতা পেতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

২. তাৎক্ষণিক বক্তব্য রাখতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন

আপনাকে যখনই কোন অনুষ্ঠান বা সভায় তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে ডাকা হয়, তখন নিশ্চয়ই আপনি যে কোন বিশেষ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করবেন সেটা ধরে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজনীয় তা হল, আপনি যেটুকু সময় কথা বলার জন্য পাবেন সেই

সময়টুকুতে আপনি যা বলতে চান সেটা কেমনভাবে সমাধা করবেন। এটা বেশ এক সমস্যা। সবচেয়ে ভালো উপায় হল যে বিষয়ে আপনি বলতে চাইবেন সে সম্পর্কে নিজের মনকে চট করে তৈরি করে ফেলা।

এমন ক্ষেত্রে যা করণীয় সে সম্বন্ধে আমার পরামর্শ হল এই রকম : মনের দিক থেকে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন সময় তাৎক্ষণিক কথা বলার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিন। এটা করার জন্য আপনাকে বেশ একটু চিন্তা করতে হবে। পৃথিবীতে এই ঠিক মত চিন্তা করা কাজটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তবে আমি নিশ্চিত যে কোন মানুষই তাৎক্ষণিক বক্তা হিসেবে নাম কিনতে বা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না যদি না সে আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে জনতা বা শ্রোতাদের মন বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করে। একজন দক্ষ বিমান-চালক যেমন আগে থেকেই সবরকম সমস্যা বা পরিস্থিতির একটা আগাম মূল্যায়ন করে নিয়ে নিজেকে যে কোন অবস্থায় মানিয়ে নিতে তৈরি রাখে; বক্তাকেও তাই করতে হয়। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়ার আগেও তাই বক্তাকে হাজার হাজার বার এ ধরণের বক্তৃতা অনুশীলন করতে হবে।

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়ার কিছু সুবিধাও আছে–যেমন, এই বক্তৃতা তেমন দীর্ঘ হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই অল্প সময় ধরে বলতে হয় বলে আপনি সহজেই আপনার বক্তব্য বিষয় ঠিক করতে পারেন। অর্থাৎ অবস্থার পরিস্থিতিতে কোন বিষয় মানানসই হবে। তৈরি হয়ে আসেন নি বলে কখনও মার্জনা চাইতে যাবেন না। এটা সকলেই ধরে নেয় আপনি সময় মত আপনার কথা শুরু করবেন।

৩. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা উদাহরণ দিন

উদাহরণ দেবেন কেন? প্রশ্নটি স্বাভাবিক। এর তিনটি কারণ আছে :

(১) যেহেতু আপনার পরের কথাটার জন্য কঠিন চিন্তা করা থেকে নিজেকে রেহাই দিতে পারবেন,আর তা হওয়ার কারণ হল অভিজ্ঞতা এমনই জিনিস যে তাৎক্ষণিক কথা বলার সময়েও তা সহজেই মনে পড়বে।

(২) আপনি কথা বলার প্রেরণা বোধ করতে থাকবেন, দেখবেন আপনার প্রথম দিকের সমস্ত দূর্বলতা আর ভয় সহজেই দূর হয়ে যাবে এবং আপনি বক্তব্য বিষয় নিয়ে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবেন।

(৩) আপনি সহজেই আপনার শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

আগেই সপ্তম পরিচ্ছেদে যেমন বলেছি, এই রকম ঘটনার উদাহারণ রাখা হল শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের নিশ্চিত পথ।

এটা সহজেই দেখা যাবে, আপনার বক্তব্যের মানবিক আকর্ষণের দিকটা সহজেই শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়। প্রথম কয়েক মুহূর্তেই এর প্রমাণ মিলবে। এইভাবে শ্রোতা আর বক্তব্য মধ্যে যে যোগসূত্র স্থাপন হয় তা সহজেই বজায় রাখা যায়। এই কারণেই আমি উদাহরণ রাখার কথা বলতে চাই।

৪. সজীবতা আর দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলুন

এ বইতে আগে যেমন বলা হয়েছে, আপনি যদি সজীবতা আর দৃঢ়তা মিশিয়ে কথা বলেন, আপনার বাইরের সজীবতা মনের চেহারাও বদলে দেবে। কাউকে বক্তৃতা করার সময় নানাভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করতে লক্ষ্য করেছেন কখনও। দেখলে বুঝবেন দক্ষ বক্তা তার অঙ্গ সঞ্চালনও করেন। এর কারণ হল শারীরিক কাজের সঙ্গে মনের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। উইলিয়াম জেমস ও এ কথা স্বীকার করেছেন।

৫. 'এখনই' এই নীতি কাজে লাগান

এমন একটা সময় আসবে যখন কেউ হয়তো আপনার কাঁধে হাত রেখে বলতে পারে, কিছু বলুন আপনি।' বা এমনও হতে পারে কোন জানান না দিয়েই কেউ হয়তো পরবর্তী বক্তা হিসেবে আপনারই নাম করে বসল।

এমন অবস্থায় পড়লে যেন সেই স্টিফেন লী ফকের ঘোড়সওয়ারের দশাই হয়-ঘোড়াটা চারদিকে ছুটতে থাকে। এমন কোন অবস্থায় পড়লে শান্ত থাকবেন। মনে রাখতে হবে, শ্রোতারা নিজেদের কথাই ভাবে। অতএব তিনটে পথ থেকে আপনি তাৎক্ষণিক বক্তৃতার জন্য প্রেরণা পেতে পারেন।

প্রথমতঃ আছে শ্রোতারা। সহজভাবে কথা বলতে গেলে এ কথাটা অনুরোধ করছি ভাল করে মনে রাখবেন। শ্রোতাদের কথা আলোচনা করবেন, তারা সমাজের কি ভাল করেন সে কথাও বলবেন।

এবার দ্বিতীয়টি হল উদ্দেশ্য। কোন্ উদ্দেশ্যে সভা হচ্ছে সেটা যাচাই করা চাই, অর্থাৎ কোন বার্ষিকী, রাজনৈতিক সভা, না সাহিত্য সভা।

শেষ পথ হল, আপনার পূর্ববর্তী বক্তা যা বলে গেছেন তারই জের টেনে কিছু উদাহরণ রাখা। সত্যিকার তাৎক্ষণিক বক্তৃতা হল সেটাই যা সত্যিই করেই তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়।

৬. তাৎক্ষণিক কথা বলবেন না, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিন

উপরের কথা দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে। তাৎক্ষণিক ভঙ্গীতে উল্টোপাল্টা, সঙ্গতিহীন কিছু বলে যাওয়াই তাৎক্ষণিক বক্তৃতা নয়। আপনাকে, আপনার বক্তব্যের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে হবে।

এই পরিচ্ছেদে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলো মেনে চললে আপনি একজন দক্ষ তাৎক্ষণিক বক্তা হতে পারেন। আপনি যা বলতে ইচ্ছুক তাকে মনে মনে দ্রুত লয়ে সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করুন . তারপর তাকে ভাষায় রূপান্তরিত করুন।

বিখ্যাত স্থপতি নির্মাণকারক বেল-গেডেস বলেন, ‘উঠে না দাঁড়ালে তার মনের চিন্তা ভাষায় রূপ দিতে পারে না। কোন জটিল বিষয়ে সহকর্মীদের জানাতে তিনি অনবরত পায়চারি করে থাকেন। এটা দেখা গেছে একবার শুরু করলে পরের কথা সহজেই এসে যায়।‘

আমাদের অনেকের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা। আমরা উঠে দাঁড়ালে ঘাবড়ে যাই। কিন্তু চেষ্টা করলেই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

১০. কথা বলার ধরন পাল্টানো

বিশ্বাস করবেন কি, সারা পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য আমরা চারটে পথই আছে জানি। এই চারটি

পথেই আমাদের মূল্যায়ন আর বিশ্লেষণ ঘটে। সেই চারটে পথ হল :

১। আমরা কি করি।

২। আমরা কেমন দেখতে।

৩। আমরা কি বলি।

৪। আমরা কিভাবে বলি।

জন-সংযোগের ক্ষেত্রে বক্তৃতা দান শেখানোর জন্য পাঠক্রম চালু করার সময় প্রথমে আমি কণ্ঠস্বর মার্জিত আর জোরালো গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রচুর অনুশীলনের বন্দোবস্ত রাখতাম। বেশ কিছুকাল এটা করার পর বুঝলাম এর কোন প্রয়োজন সত্যিই নেই, কারণ যারা রোজ তিন ও চার ঘন্টা সময় ব্যয় করতে পারেন তারাই এটা পারেন। সাধারণ মানুষ যারা জনসংযোগ চান তারা এত সময় ব্যয় করতে পারবেন না। আমি বুঝলাম জন্মদও কণ্ঠস্বরই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আমার সৌভাগ্য যে সময় থাকতেই ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। আমি বরং বক্তাদের সাধারণ বক্তৃতাদানের ভয়

মুক্ত করতে চেষ্টা চালালাম-এর ফলও হল আশ্চর্য রকম ভাল। এবার যা করণীয় সে কথাই বলব।

১. আত্মসচেতনার খোলস ছাড়ুন

আমার পাঠক্রমে একটা চেষ্টা চালানো হয় বয়স্ক আত্মসচেতন মানুষদের যতখানি সম্ভব মুক্ত ভাবনার মানুষ হয়ে উঠতে। প্রায় হাত জোড় করে তাই সব সদস্যদের অনুরোধ করি, তারা যেন দয়া করে তাদের খোলস ছেড়ে বাইরে আসার চেষ্টা করেন। তাদের বলি এরকম করলে দুনিয়া তাদের আদর করে কাছে টেনে নেবে। মার্শাল বাক যেমন যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন, 'ধারণাটা খুবই সহজ, তবে ঠিক মত কাজে লাগানোই কঠিন।' এই কঠিন হয়ে থাকা কথাটা শুধু শারীরিক দিক থেকেই হয় না এটা মনের দিকেও থাকে। এ একটা বড় রকম বাধা।

শ্রোতাদের সামনে স্বাভাবিক থাকা তেমন সহজ নয় সন্দেহ নেই। অভিনেতারা কথাটা জানেন। আপনার বয়স যখন চার বছর ছিল তখন বোধ হয় অনায়াসেই কোন মঞ্চে উঠে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছেন, কিন্তু যখন আপনার বয়স চব্বিশ তখন মঞ্চে উঠলে অবস্থাটা কি রকম হয়? চারবছর বয়সে যে স্বাভাবিকতা ছিল তা কি আর অবশিষ্ট থাকে? না, আপনি তখন নিজেকে স্বভাবতই গুটিয়ে ফেলার অবস্থাতেই থাকবেন।

বয়স্কদের এইভাবে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শেখানো বেশ কঠিন কাজ না বলাই শ্রেয়। এটা শেখানোর সময় কথা বলার ফাঁকে বহুবার আমি কোন সদস্য বক্তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়েছি আর বলেছি, একজন স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলুন।'

বহুবারই দুশ্চিন্তা নিয়ে আমায় বাড়ি ফিরতে হয়েছে। না, জেনে রাখবেন, কথাটা অত সহজ শোনাচ্ছে কাজে আদৌও তা নয়। . আমি আমার ক্লাসের পাঠক্রমে সদস্যদের কথা বলার ফাঁকে একটু অভিনয়ের ভঙ্গী করতে বলি। তারা এ রকম করার পর আশ্চর্য হয়ে দেখে কাজটা বোকার মত মনে হলেও নিজেদের করার পর তা আর মনে হয় না। ক্লাসের শ্রোতারাও অবাক না হয়ে পারে না।

একাজ করতে গেলে আপনি আসলে পাখির ডানা মেলার মতই মুক্ত বলে নিজেকে ভাবেন–আপনি তখন আর খাঁচায় বন্ধ থাকেন না। মানুষ কেন দল বেঁধে নাটক দেখতে ছোটে জানেন? এর একটা মাত্রই কারণ আছে–তারা তাদের মত মানুষকে, সামনে নির্ভয়ে মুক্ত হয়ে আবেগ ইত্যাদির প্রকাশ করতে দেখতে চায়।

২. অন্যের নকল করবেন না

আমরা সেই সব বক্তাকে প্রাণ দিয়ে প্রশংসা জানাই যারা চমুকারভাবে কথা বলেন আর নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পান না বা ঘাবড়ে যান না। শ্রোতাদের সামনে তারা বেশ স্বাভাবিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে দুই ভাই, স্যার রস আর স্যার কিথ স্মিথের লণ্ডনে দেখা হয়। তাঁরা সবে মাত্র লণ্ডন থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকারের ঘোষিত পঞ্চান্ন হাজার ডলার পুরস্কার জিতে ছিলেন। তাঁরা সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সাড়া তুলেছিলেন আর রাজা তাদের নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

ক্যাপ্টেন হার্লি নামে একজন বিখ্যাত লোকচিত্রী তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চলচ্চিত্র তুলেছিলেন। আমি তাঁদের একটা ছবিসহ প্রমাণ বিষয়ক কথিকা লিখতে সাহায্য করি। তারা দিনের পর দিন কথিকাটি অনুশীলন করেছিলেন।

তাঁদের তিনজনের অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম ছিল। পাশাপাশি বসে তাঁরা প্রায় অর্ধেক বিশ্ব ভ্রমণ করেন। তারা একই বক্তব্য রেখে চলেছিলেন। তবুও তাঁদের বক্তব্য কিন্তু একই রকম শোনায় নি।

যে কোন বক্তব্যের মধ্যে শুধু সাজানো কথাগুলো ছাড়াও থাকে বাচনভঙ্গী–আর এরই দাম সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে যে রঙ আর রস থাকে তারই গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী হয়। আপনি যা বলেন তার চেয়ে কিভাবে বলেন সেটাই বিচার্য।

বিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী ব্রুলফ একবার একজন ছাত্রের আঁকা ছবি সংশোধন করে দেন। ছেলেটি পাল্টানো ছবি দেখে অবাক হয়ে বলে ওঠে : 'কী আশ্চর্য! আপনি শুধু একটা আঁচড়েই ছবিটি একেবারে বদলে দিয়েছেন।' ফ্রলফ উত্তর দেন : 'শিল্প আঁচড় থেকেই জন্মায়।' বক্তৃতার ব্যাপারটাও তাই।

ইংরেজদের পার্লামেন্টের বিষয়ে একটা প্রাচীন প্রবাদ চালু আছে। সেটা হল কোন বিষয়ে নয়, সব কিছু নির্ভর করে একজন বক্তা কিভাবে সেটা বলেন তার উপর। বহুবছর আগে কথাটা বলেন কুইন্টিলিয়ান, ইংল্যাণ্ড যখন রোমের উপনিবেশ ছিল।

বিখ্যাত হেনরী ফোর্ড বলেছিলেন, সমস্ত ফোর্ডরা একই রকম, অথচ কোন দুজন ফোর্ড এক নয়। সূর্যের আলোয় প্রতিটি নতুন জীবনই নতুন কিছু।এর আগে এমন কিছু ছিল

না, আর ভবিষ্যতেও হবে না। প্রত্যেক তরুণের তাই উচিত অন্যের চেয়ে আলাদা করে নিজেকে চিহ্নিত করতে। একজনের মধ্যে যে বিদ্যুৎ স্পর্শ আছে তাকে জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়েই তার গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

জনসংযোগ আর বক্তৃতার ব্যাপারেও কথাটা প্রযোজ্য। আপনার মত আর কোন মানুষ নেই। কোটি কোটি মানুষের হাত, পা, নাক, চোখ, মুখ থাকে,অথচ তাদের কাউকেই আপনার মত দেখতে নয়। স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আপনি যখন বক্তব্য রাখবেন অন্য কেউই আপনার মত পারবে না।

স্যার অলিভার লজ একজন আদর্শ বক্তা ছিলেন। তাঁর বিশেষত্ব ছিল টাক মাথা আর দাড়ি। অথচ তিনি লয়েড জর্জকে নকল করার চেষ্টা করলে কিছুতেই বিখ্যাত হতে পারতেন না।

আব্রাহাম লিঙ্কন আর সিনেটের স্টিফেন এ, ডগলাস ছিলেন দুটি আলাদা চরিত্র আর বৈশিষ্ট্যের মানুষ। ১৮৫৮ সালে আমেরিকায় তাদের মধ্যেই বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

ডগলাস ছিলেন একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ। লিঙ্কন ছিলেন একদম বিপরীত। ডগলাসের ভাবভঙ্গী ছিল রুচিপূর্ণ। লিঙ্কনের মোটেও তা নয়। ডগলাসের মধ্যে কোন রকম রসাল ভাব থাকতো না, অথচ লিঙ্কন ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ বক্তা। ডগলাস কদাচিত হাসতেন। লিঙ্কন কথায় কথায় হেসে উদাহরণ রাখতেন, ডগলাস দ্রুত চিন্তা করতেন আর লিঙ্কনের মনের গতি ছিল অতি বীর।

অথচ এ ধরণের বিভিন্নতা আর বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও দুজনেই হয়ে উঠেছিলেন শ্রোতাদের কাছে একান্ত প্রিয় বক্তা। দুজনের প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্য দিয়ে শ্রোতার মন জয় করেন, কেউ কাউকে নকল করেন নি।

৩. শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলা

হাজার হাজার মানুষ যেমনভাবে কথা বলে সেই বিশেষ ভঙ্গী নিয় একটা উদাহরণ দিই আসুন। একবার আমি সুইজারল্যান্ড এলাকায় আল্পস পর্বতের কাছে মুরেন গ্রীষ্মবাসে ছিলাম। আমি লণ্ডনের কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত এক হোটেলে ছিলাম, আর তারা সাধারণতঃ লণ্ডন থেকে অতিথিদের জন্য কিছু কিছু বক্তৃতা পাঠাত। এদের মধ্যে একজন ছিলেন নামকরা ঔপন্যাসিক। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'উপন্যাসের ভবিষ্যত'। ঔপন্যাসিক ভদ্রমহিলা স্বীকার করেছিলেন লেখাটা সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই নেই-ওটা বলতে তার কোন রকম আগ্রহও নেই। যাই হোক লিখিত বক্তৃতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে তিনি কিছু নোট করে নিলেন তারপর শ্রোতাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন। এবার শ্রোতাদের সম্পূর্ণ অগ্রআহ্য করে তাদের দিকে একদম না তাকিয়ে তিনি কখনও তার হাতের কাগজে, কখনও বা মেঝের দিকে, কখনও বা শ্রোতাদের মাথার উপর দিকে তাকিয়ে প্রাগৈতিহাসিক এক ভঙ্গীতে কি যে বলে গেলেন কে জানে?

ব্যাপার হল এটা বক্তৃতা দেবার কোন পদ্ধতিই নয়। এ হল স্বগতোক্তি, এর মধ্যে যোগাযোগের কোনরকম চিহ্নই থাকে না। অথচ ভাল বক্তৃতায় সেটাই প্রধান প্রয়োজন। এটা হল সংযোগ স্থাপন। শ্রোতাদের বোঝাতে হবে যে তাদের কাছে একটা যোগসূত্র রাখা হচ্ছে–বক্তার সঙ্গে তাদের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করা চাই। যে বক্তৃতার কথা

বললাম, এরকম বক্তৃতা গোবি মরুভূমির জনশূন্য প্রান্তরেই যদি দেওয়া যায় কোন জীবন্ত মানুষের সামনে, তার কোন দাম থাকে না।

কথা বলার কায়দার উপর নানা রকম সব বাজে কথা অনেকই বলেছেন। নানা রকম আইন কানুনের বেড়াজালেও তা ঢাকা। সব ব্যাপারটাই হাস্যকর। বিক্রয় প্রতিনিধিরা এ ধরণের নানা বই পাঠাগারগুলোয় হাতড়ে বেড়িয়েছেন, যার সবগুলোই বাজে।

বিশ শতকের পর এই ধরণের নানা স্কুল গজিয়ে উঠেছে। এর সবই আধুনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি

মার্ক টোয়েন যখন একবার নেভাদা মাইনিং স্কুলে একটা বক্তৃতা শেষ করেন তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে : এটাই কি আপনার স্বাভাবিক বক্তৃতার স্বর?

শ্রোতারা ঠিক এটাই চান : আপনার স্বাভাবিক স্বর। এ ধরনের স্বাভাবিক স্বর লাভ করা যায় একমাত্র অনুশীলন কারা মধ্য দিয়ে। যখন অনুশীলন চালাবেন তখন মাঝে মাঝেই থেমে নিজেকে প্রশ্ন করবেন : ‘শোন হে! কিছু ভুল হল নাকি? ঠিক করে নাও।’ এবার শ্রোতাদের মধ্যে মনে মনে কাউকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে কাল্পনিক কথাবার্তা বলতে থাকুন। মনে ভাববেন যে আপনাকে কোন প্রশ্ন করেছে। আর আপনি তার উত্তর দিচ্ছেন। সে প্রশ্ন যে কোন রকমই হতে পারে।

স্যার অলিভার লজ নামে একজন বক্তাকে পরমাণু ও পৃথিবী সম্পর্কে বলতে বলেছিলাম। তিনি তার কথায় মগ্ন, একাত্ম হয়ে ছিলেন। এইভাবেই বক্তৃতায় আপনাকে একাত্ম হতে হবে।

শ্রোতাদের সামনে এমনভাবে বক্তৃতা করবেন না যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারেন আপনি আগে থেকে বক্তৃতাটা নিখুঁত তৈরি করে এসেছেন। স্বাভাবিক ভাবে আপনার কথা হতে হবে যাতে শ্রোতারা আদৌ বুঝতে না পারেন এ বক্তৃতা আপনার পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তৈরি। একজন সত্যিকার ভাল বক্তা এ রকম করবেন না।

৪. আপনার কথায় মনপ্রাণ সঁপে দিন

প্রচেষ্টা আর আগ্রহ আপনার সাহায্যে আসবে। কোন লোক যখন তার আবেগের অনুসারী হয় তখন তার প্রকৃত সত্ত্বা নিজের উপরে এসে যায়। আবেগের উত্তাপ সমস্ত রকম বাধা দূর করে দেয়। বক্তা কাজ করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তিনি কথা বলেন স্বাভাবিকভাবে।

অতএব শেষ দিকে এই স্বর প্রমোশন ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তাহলে আপনার মনপ্রাণ সঁপে দেওয়া।

ডীন ব্রাউন একবার তাঁর লণ্ডনে দেয়া বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমার একজন বন্ধু একবার কোন গির্জার অনুষ্ঠানে লণ্ডনে যেভাবে চমৎকার বর্ণনা দিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন তা কোনদিনই ভুলব না। সেই বন্ধুর নাম জর্জ ম্যাকডোনা। হিব্রুর একাদশ পরিচ্ছেদ পাঠ করার পর সে যেভাবে বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তব্য রাখল তাতে অবাক না হয়ে পারিনি। তার সমস্ত মন আর হৃদয় সে ঢেলে দিয়েছিল।

আসল রহস্য হল এটাই–সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করা। তাসত্বেও বলব কথাটার যেন কোন মানে হয় না তাই বুঝি জনপ্রিয়ও নয়। সাধারণ বক্তারা চায় সহজ কোন নিয়ম বা কাজের পদ্ধতি।

এডমাণ্ড বার্ক চমৎকার যুক্তিগ্রাহ্য আর ভাষায় লালিত্য মেশানো সব বক্তৃতা রচনা করেছিলেন যে, সেসব আজও ক্লাসিক বলে সব কলেজে পড়ানো হয়। অথচ বার্ক বক্তা হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিলেন। তাঁর ওই অপূর্ব বক্তৃতা তিনি নিজে শোনাতে পারতেন না। তাই হাউস অব কমন্স সভায় তাঁর নাম হয় সান্ধ্যভোজের ঘন্টা। বার্ক কথা বলতে উঠলেই অন্য সব সদস্যরা কাশতে শুরু করতেন আবার কেউ কেউ বেশ আরাম করে বসে ঝিমুতে আরম্ভ করতেন।

ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে অবহিত হোন

মার্ক টোয়েন কিভাবে চমৎকার ভাষা আয়ত্ত্ব করেছিলেন জানেন? অল্প বয়সে তিনি মিশোরী থেকে নেভাদা পর্যন্ত ধীরগতির যানবাহনে ঘুরে বেড়াতেন। এইভাবে বেড়ানোর সময় বেশি মালপত্র নেওয়া সম্ভব হত না। তাসত্ত্বেও মার্কটোয়েন সঙ্গে রাখতেন একখানা ওয়েবস্টারের বিশাল অভিধান। এর কারণ তিনি নিজের ভাষাজ্ঞান নির্ভুল করে তুলতে চাইলেন।

অভিধান পাঠ করা পিট আর লর্ড চ্যাথামেরও নেশা ছিল। তাঁরা অভিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠা প্রায় কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। প্রতিটি খ্যাতনামা লেখক আর বক্তাও তাই করেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ইংরাজী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা তিনি আমেরিকার তরফে করেছিলেন তাঁর সেই লেখা, সাহিত্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্য। কিভাবে তিনি ভাষায় পারদর্শী হন তিনি নিজেই তা লিখে গেছেন :

'আমার বাবা কখনও বাড়িতে ভুল উচ্চারণ বরদাস্ত করতেন না। কারও কোন ভুল হলেই তা সংশোধন করে দিতেন। কথাবার্তা বলার সময় তিনি আমাদের নতুন শব্দ প্রয়োগে উৎসাহ দিতেন আর তা মনে রাখতে বলতেন।'

বক্তাকে তাই তার ভাষাজ্ঞান বাড়ানোয় নজর দিতেই হবে। অভিধান তাকে প্রভূত সাহায্য করতে পারবে।

৫. কণ্ঠস্বর দৃঢ় নমনীয় করে তুলুন

আমরা যখন শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তব্য তাদের কাছে পেশ করি তখন আমরা সাধারণভাবে কাজে লাগাই আমাদের কণ্ঠস্বর আর শরীরিক অনেক কিছু। আমরা কাঁধ নাচাই, হাত নাড়তে থাকি। ভূ তুলি, কণ্ঠস্বরও ওঠানামা করাই, কখনও ধীরে কখনও দ্রুতলয়ে কথা বলে যাই। এসবের প্রয়োজন বক্তব্যের সঙ্গে তাল মিলিয়েই করতে হয়। তবে মনে রাখা দরকার এ সবই হল আসল কোন কারণ নয়। কণ্ঠস্বরে যে দোলা লাগে, তা ওঠানামা করে। এসবই হল আবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে–মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই কারণেই যে বিষয় সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল সেই বিষয়

নিয়ে বক্তব্য রাখা দরকার। এই কারণেই আমরা সেই বিষয় নিয়ে শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হতে আগ্রহ বোধ করি।

যেহেতু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই যৌবনের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা আর দৃপ্ততা বাড়াতে থাকি, তখনই প্রয়োজন হতে থাকে কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভরশীলতা। এটা দরকার শ্রোতাবৃন্দের সঙ্গে সংযোগ ধারাটি বজায় রাখার জন্যই।

একটা কথা এ বইয়ের পাঠকদের জেনে রাখা দরকার। তা হল, আমরা হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কণ্ঠস্বর জোরে বা আস্তে করতে থাকি। এর ফলে আমরা অসতর্ক হয়ে পড়ি। এই কারণেই এ বইয়ে বলতে চেয়েছি যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাব বজায় রেখে বক্তব্য রাখতে। এজন্য দরকার স্বভাবসিদ্ধ পথে আমাদের ধ্যানধারণা প্রকাশ করতে চাওয়া। কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, স্বরগ্রাম, গতি ইত্যাদির নিরীখে নিজেকে তৈরি করা ব্যাপারটা ভারি চমৎকার একটা পথ। এটা করা যায় একটা টেপ রেকর্ডারের সাহায্য নিয়ে। এছাড়াও করা যায় বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য নিয়ে। যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য এ ব্যাপারে পাওয়া যায় তাহলে তো কোন প্রশ্নই নেই। শুধু বই পড়ে এবিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ সম্ভব হয় না-এজন্য দরকার অভ্যাসও, না হলে শ্রোতাদের সামনে সমস্যায় পড়তে হয়।

১১. বক্তার পরিচিতি, উপস্থিতি আর পুরস্কার গ্রহণ

আপনাকে যখন জনগণের সামনে কিছু বলার জন্য ডাকা হয় তখন আপনি আর একজন বক্তাকে পরিচিত করাতে পারেন যিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ ইত্যাদি করতে পারেন। আপনি হয়তো কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে থাকতে পারেন। তেরোর পরিচ্ছেদে আমি দীর্ঘ বক্তৃতা আয়ত্ত করার বিষয়ে বলব। আর এই পরিচ্ছেদে বলব বক্তব্যের পরিচিতি কিভাবে দিতে হয় সে সম্পর্কে। এ ছাড়াও আমি আপনাদের কিছু মূল্যবান সূত্র দেব কিভাবে নিজের উপস্থিতি সহজ করে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারা যায়।

বিখ্যাত লেখক আর বক্তা, জন ম্যাসন ব্রাউন, যার সজীব বক্তৃতা সারা দেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, একরাত্রিতে তিনি বক্তৃতা দিতে যান। তাকে একজন পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

লোকটি ব্রাউনকে বললেন, ‘যা বলতে যাচ্ছেন তা নিয়ে ভাববেন না। আরাম করুন। বক্তৃতা তৈরি করে রাখা আমার পছন্দ নয়। এই তৈরি হওয়ায় কাজ হয় না, এতে সব ব্যাপারটারই মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। আমি বক্তৃতা করার সময় একটা প্রেরণার অপেক্ষায় থাকি আর তাতে কখনও ব্যর্থ হই না।’

এমন চমৎকার কথাগুলো শুনে মিঃ ব্রাউন ভেবেছিলেন তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাও এমনই সুন্দর হবে। কিন্তু যা ঘটল সেটা মিঃ ব্রাউন তার অ্যাকিউসটমড অ্যাজ আই অ্যাম’ বইতে বলেছেন। তার বন্ধু এইভাবে শুরু করেন :

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি? আজ আপনাদের জন্য কিছু খারাপ সংবাদই এনেছি। আমরা চেয়েছিলাম আইজ্যাক এফ. মার্কোসন আপনাদের সামনে আজ বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়ায় আসতে পারেন নি। (হাততালি)। এরপর আমরা সেনেটর ব্লেডরিজকে আমন্ত্রণ করি বক্তৃতা দিতে ... কিন্তু তিনি খুবই ব্যস্ত। (হাততালি)। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করি কানসাস সিটির ড. লয়েড গ্লোগ্যানকে আনতে (হাততালি)। শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি–জন ম্যাসন ব্রাউনকে। (সব চুপচাপ)।

এই মারাত্মক কাণ্ড দেখে মি. ব্রাউন কেবল বলেছিলেন : আমার সেই প্রেরণাদায়ক বন্ধু যে আমার নামটা ঠিকঠাক বলতে পেরে ছিলেন তাই নেহাৎ সৌভাগ্য।'

এতে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ভদ্রলোক প্রেরণা নিয়ে অতখানি নিশ্চিন্ত থাকা সত্ত্বেও বন্ধুকে কতটা এগিয়ে নিতে পারতেন। চেষ্টা করলে ব্যাপারটা আরও মারাত্মক হতে পারত। পরিচিতি দিতে গিয়ে তিনি শ্রোতা আর বক্তা দুজনেরই প্রচণ্ড ক্ষতি করেন। অনেক সভাতেই সভার কর্তারা এভাবে ব্যর্থ হন আর শ্রোতা ও বক্তার প্রচণ্ড ক্ষতি করে বসেন।

কোন বক্তৃতা করার মুখবন্ধ আর পরিচিতি অনেকটা সামাজিক পরিচয়ে মতই উদ্দেশ্যে পূর্ণ থাকে। এতে শ্রোতা আর বক্তা কাছাকাছি আসতে পারেন, একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়াও গড়ে ওঠে এবং দুদলের মধ্যে একটা একাত্মতা তৈরি হয়। যিনি বলেন, আপনাকে কোন বক্তৃতা দিতে হবে না। শুধু বক্তাকে পরিচয় করালেই চলবে, তিনি ঠিক বলেন না। এটা জেনে রাখা সকলেরই উচিত যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মুখবন্ধ যদি বক্তৃতা দেওয়া হয় তার মূল্য অনেকখানি। অনেকেই ভুল বশতঃ তাকে গুরুত্ব দেন না।

‘পরিচিতি’ কথাটা লাতিন কথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কথাটির অর্থ ভিতরের কথা জানানো। অর্থাৎ যে বক্তার পরিচয় দেওয়া হবে তার সব কথাই যেন শ্রোতারা জানতে পারেন। এর ফলে শ্রোতারা বক্তার সম্পর্কে আগ্রহী হবেন। তারা বুঝতে পারবেন যে বিষয়ে কথা বলা হবে বক্তা তার উপযুক্ত। অন্যভাবে বলা যায় ‘পরিচিতি’ হল শ্রোতাদের কাছে বিষয়বস্তু বিক্রী করা এবং তারই সঙ্গে বক্তাকেও। আর এ কাজ করা দরকার যত কম সময়ে সম্ভব।

এবার বলুন তাই কি সত্যিই করা হয়? কখনই না। দশ বারের মধ্যে অন্ততঃ ন’ বারই না। প্রতিটি পরিচিতিই হয়ে ওঠে দুর্বল, ক্ষমার অযোগ্য। একাজ করতে পারলে ঢের সমস্যারই হয়তো সমাধান হতে পারত।

বক্তা আর তার বক্তৃতার বিষয়ে পরিচিতির জন্য এবার কিছু সূত্র দিচ্ছি।

১. যা বলতে চান ভাল করে তৈরি রাখুন

পরিচয়জ্ঞাপক বক্তৃতা ছোট্ট হলেও, হয়তো মিনিট পাঁচেকই লাগে এতে, এটা ভাল মতই তৈরি করা দরকার। প্রথমে আপনাকে বিষয় নির্বাচন আর মালমশলা জোগাড় করতে হবে। এটা তিনটে বিষয়ে গাঁথা থাকবে : বক্তার বক্তব্য বিষয়, ওই বিষয়ে কথা বলার জন্যে বক্তার যোগ্যতা, আর তার নাম। মাঝে মাঝে চতুর্থ একটা বিষয় দরকার হয়–যে বিষয় বক্তা বেছে নিয়েছেন শ্রোতাদের কাছে তা কেন আদরণীয় হবে।

প্রথমেই আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে বক্তৃতার সঠিক শিরোনাম আপনি জানেন, আর বক্তা যে ওই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন। পরিচয় দানের মধ্যে কোন গলদ থাকা ব্যাপারটার মত আর কিছুই বক্তার কাছে বিরক্তিকর হতে পারে না। এতে আরও মনে হয় বক্তব্য বিষয়ে বক্তার অধিকারই যেন নেই। এটা এড়ানো যায় শুধু বক্তার সম্বন্ধে সব ভাল ভাবে জানা থাকলে আর বক্তব্য বিষয়ে বেশি কথা না বলে। তবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে থাকলে বক্তব্য বিষয়ের শিরোনাম আপনার জানা থাকতেই হবে–সঠিক ভাবেই তা বলা চাই-শ্রোতাদের আগ্রহ জাগাতেই সেটা চাই। যদি সম্ভব হয় তাহলে সেটা সরাসরি বক্তার কাছ থেকেই সংগ্রহ করবেন। যদি কোন কারণে তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে আগে ভাগেই একটা কাগজে সেটা লিখে রাখতে পারলে বক্তার কাছে যাচাই করে নিন।

তবে আপনার আসল দরকার বক্তার সমস্ত গুণাগুণ সম্পর্কে সঠিক একটা ধারণা। বক্তা যদি অত্যন্ত নামী কোন ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে তার সম্বন্ধে জেনে নেওয়া তেমন কঠিন কাজ হবে না। আসল কথা আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় হবে বক্তার জীবনী, তাঁর কৃতিত্ব, তাঁর বক্তব্য বিষয়ে যথাযথ ধারণা ইত্যাদি। মোট কথা সবই যেন নির্ভুল তথ্য হয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি একবার একজন নামকরা বক্তাকে–যিনি অনেক জানেন'-আইরিশ কবিকে পরিচয় করাতে দেখি। সেই আইরিশ কবি হলেন ডব্লিউ. বি. ইয়েটস। ইয়েটসের নিজের কবিতা পড়ার কথা ছিল। এর কয়েক বছর আগে ইয়েটস তাঁর কাব্য প্রতিভার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল পুরস্কার পান। আমার ধারণা শ্রোতাদের মধ্যে অন্তত শতকরা দশজনই জানতো না নোবেল পুরস্কারের মূল্য কতখানি। তাই দুটি

বিষয়েই জানানো উচিত ছিল। অথচ সে ধার দিয়ে আদৌ না গিয়ে সভাপতি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী আর কাব্য সম্বন্ধে বলে গেলেন।

অনেক সময়েই দেখা যায় সভায় পরিচয় দানের সময় বক্তার নামটাও ঠিক ঠিক বলা যায় না। জন ম্যাসন ব্রাউন বলেছেন বহুবার হাস্যকরভাবে তাঁর ভুল নাম সভায় বলা হয়। কোন সময় তার নাম বলা হয় জন ব্রাউন ম্যাসন, কখনও বা জন স্মিথ ম্যাসন। বিখ্যাত কানাডীয় হাস্যরস সাহিত্য রচয়িতা ষ্টিফেন লীফক তার একটা বইয়ে লিখেছেন এক সভায় তাঁর পরিচয় দেওয়া হয় এইভাবে :

'আজকে অনেকেই এখানে এসেছেন মি. লীরয়েডের কথা শোনার জন্য কে তার নাম জানেন? মিঃ লীরয়েড তো আমাদের একান্ত পরিচিত।

ভাবুন ব্যাপারটা, লীফক হয়ে যান লীরয়েড!

তাহলে পরিচয় প্রদানে কি ধরণের কথা বলা উচিত? নীচে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয় :

'আমাদের বক্তা নিজের বিষয়ে একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি যা বলতে এসেছেন তা শোনার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি, বহুদূর থেকেই এজন্য তিনি এখানে এসেছেন। তাই শ্রীঅমুককে আপনাদের সামনে পরিচিত করাতে পেরে আমি গর্ব অনুভব করছি।'

২. টি. আই. এস সূত্র অনুসরণ করুন

পরিচয় প্রকাশের কাজে টি. আই. এস সূত্র আপনার গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কাজ দেবে। এ হল এইরকম :

১। টি. হল টপিক্স বা বিষয়। অতএব বক্তার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে প্রথমেই শ্রোতাদের অবহিত করবেন।

২। আই. হল মুখবন্ধ বা ইম্পোরটেন্স। এ ব্যাপারে বক্তব্যের মুখ্য বিষয় মুখবন্ধ দিয়ে শ্রোতাদের অবহিত করুন।

৩। এস. হল স্পিকার বা বক্তা। এক্ষেত্রে বক্তার কৃতিত্ব সুনাম এবং দক্ষতার বিষয়ে সকলকে জানান।

তার নাম প্রকাশ করুন বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে।

এই ফর্মূলা বা সূত্র নানাভাবেই কাজে লাগাতে পারেন, আর তা করা যাবে আপনার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

একটা উদাহরণ রাখছি। এটি 'নিউইয়র্ক সিটি' কাগজের সম্পাদক হোমার থর্ন নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানীর কর্মকর্তা জর্জ ওয়েলবাউমকে কিছু সংবাদপত্রের কর্মীদের সামনে পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন :

ভদ্র মহোদয়গণ, আজ আমাদের বক্তার বক্তব্য বিষয় হল 'টেলিফোন ব্যবস্থা ও আপনি'।

'আমার মনে হট কেড যখন টেলিফোন করতে চান তারপর যা হয় সেটা একটা মস্ত রহস্য।'

'আপনারা ভুল নম্বর পান কেন? কেনই বা নিউইয়র্ক থেকে শিকাগোয় টেলিফোন করা পাশের শহরে করার চেয়ে কঠিন হয়ে পড়ে? আমাদের বক্তার এর উত্তর জানা আছে। গত বিশ বছর ধরে এ নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেছেন।'

'আজ তিনি আপনাদের সামনে কথা বলবেন। তিনি আজ আপনাদের কাছে একজন দেবদূত। তিনি টেলিফোন কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।'

'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, এবার আপনাদের সামনে আসছেন মিঃ জর্জ ওয়েলবাউম'।

লক্ষ্য করে দেখুন কি কৌশলে পরিচয় প্রদান করা যায়। আমার বিশ্বাস এই পরিচয় প্রদানের কথাগুলো কখনই মুখস্থ করা হয়নি–এটা কখনও করা উচিত নয়। পরিচিতি দান সব সময়েই স্বতঃস্ফুর্ত হওয়া চাই।

৩. উৎসাহী হয়ে উঠুন

কোন বক্তাকে পরিচিত করার সময় আপনার হাবভাবের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ হতে চাইবেন। শুধু মুখের কথা না বলে আপনার ভাবে, আবেগে তা প্রকাশ করা চাই। পরিচয় প্রকাশ করার মুহূর্তে যদি বেশ কিছুটা রহস্যের আমেজ আনতে পারেন তা হলে তো কথাই নেই। শ্রোতারা তা পরিপূর্ণ উপভোগ করবেন।

আপনাকে পরিচিতি প্রদানের সময় প্রথমে বক্তার বক্তব্য বিষয় উল্লেখ করতে হবে। কথা বলার শেষেই বক্তার পরিচয় প্রদান করা দরকার। এই সময় স্পষ্ট উচ্চারণে, থেমে থেমে সঠিক নামটি করবেন।

আরও একটা কথা অবশ্য মেনে চলা চাই–তা হল পরিচয় প্রকাশ করার সময় কোনভাবে কখনই বক্তার দিকে তাকাবেন না। শ্রোতাদের কথাও ভাববেন না।

৪. আন্তরিক হয়ে উঠুন

সবশেষে আন্তরিক হওয়া চাই। কোন হালকা কথা বলবেন না। কোন বেফাঁস মন্তব্য মারাত্মক হতে পারে। শ্রোতারা এ ধরণের মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। মনে রাখবেন বক্তার সঙ্গে আপনার সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু শ্রোতাদের সঙ্গে তা থাকে না। সেটা গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনারই। অতএব আপনাকে সেইভাবেই চলতে হবে।

৫. পরিচিতি প্রদানের বক্তৃতা ভালভাবে তৈরি রাখুন

‘এটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের মনের সবচেয়ে বড় আকাঙক্ষা হল সম্মান পাওয়া।‘

কথাটা বিখ্যাত লেখিকা মার্জোরি উইলসন যখন বলেন তখন সত্যিকার সকলের মনের কথাটাই বলেছিলেন। আমরা সবাই জীবনে এগিয়ে চলতে চাই। আমরা চাই সকলে

আমাদের প্রশংসা করুক। আমরা অন্যের নজর কাড়তে চাই। আর সেটা শুধুমাত্র মৌখিক প্রশংসা বা কোন পুরস্কার যাই হোক না কেন। এটার যাদুকরী শক্তি আছে।

বিখ্যাত টেনিস তারকা অ্যালথিয়া গিবসন এই সব মানব মনের আকাঙ্খর কথা তাঁর আত্মজীবনী 'আই ওয়ান্টেড টু বি সামবডি' তে চমৎকারভাবে বলেছেন।

আমরা যখন কোন পরিচয়জ্ঞাপক কথা বলতে চাই তখন আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই বক্তা সত্যিই একজন বিখ্যাত মানুষ। কোন বিশেষ বিষয়ে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। আমরা তাই তাঁকে সম্মানিত করতে চাইছি! আমরা যে পুরস্কার দিতে চাই তা হয়তো অতি সামান্যই, কিন্তু গ্রহীতার কাছে তার মূল্য অনেকখানি। শ্রোতারাও এ ঘটনা চিরজীবন মনে রাখেন।

পরীক্ষায় প্রমাণিত শ্রেষ্ঠ একটি সূত্রের উদাহরণ দিচ্ছি :

১। কেন পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে সেকথা ঘোষণা করুন, হয়তো তা দীর্ঘ কাজের জন্য বা কোন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করায়, সরল ভাষায় তা জানান।

২। পুরস্কার গ্রহীতার জীবন সম্পর্কে সামান্য কথায় শ্রোতাদের অবহিত করুন।

৩। বলুন এই পুরস্কার বক্তার কতখানি প্রাপ্য, আর তা প্রদান করে আপনারা কতটা আনন্দিত।

৪। পুরস্কার প্রাপককে অভিনন্দিত করে প্রত্যেকের হয়ে শুভেচ্ছা জানান।

৫। একটা কথা মনে রাখা চাই কথাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাই আন্তরিকতার স্পর্শ। তবে এও মনে রাখা দরকার বক্তা বা পুরস্কার গ্রহীতার প্রশংসা করার সময় যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করা হয়, কারণ কারও সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা তেমন কঠিন নয়। আমাদের কথাবার্তায় বন্ধুত্বের ভাবটাই বজায় রাখা চাই।

৬। গ্রহণের বক্তব্যে আন্তরিক হন

পরিচিতি দানের বক্তব্যের চেয়ে এটি আরও ছোট হওয়া দরকার। এটা কখনই মনে মনে তৈরি রাখা যায় না, অথচ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক হওয়ায় সুবিধাও অনেক। শুধু ‘ধন্যবাদ’ বা ‘আজ আমার দারুণ আনন্দ’ ইত্যাদিতে কাজ হয় না। একটা সূত্র রাখা চাই এ বিষয়ে। তা হল এই রকম :

১। সকলকে আন্তরিকতা মেশানো ধন্যবাদ জানান।

২। যারা আপনাকে সহায়তা করেছেন, সেই সহকর্মী, মালিক বন্ধু বা আত্মীয়দের প্রশংসা করুন।

৩। সকলকে জানান পুরস্কার আপনার কাছে কতখানি মূল্যবান এবং সকলকে তা তুলে দেখান। কিভাবে তা কাজে লাগাবেন সকলকে বলুন।

৪। সকলকে এজন্য আপনার কৃতজ্ঞতা জানান।

১২. দীর্ঘ বক্তৃতা তৈরি

কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কোন পরিকল্পনা ছাড়া বাড়ি তৈরি করেন না, সেক্ষেত্রে কোন রকম তৈরি না হয়ে বক্তৃতাই বা দেবেন কেন?

কোন বক্তৃতার ব্যাপার হল সমুদ্রে ভ্রমণের মত। তাই যিনি কোথা থেকে শুরু করতে হবে জানেন না, তিনি কোথায় পৌঁছবেন তারও ঠিক থাকে না।

নেপোলিয়ন যে কথা একবার বলেছিলেন মনে হয় তা সোনার অক্ষরে বাঁধিয়ে রাখা দরকার। কথাগুলো এই : যুদ্ধ হল এক ধরণের শিল্পবিজ্ঞান, তাই আগে হতে পরিকল্পনা না নিলে সফলতা হবে অসম্ভব।

বক্তৃতা দেবার ব্যাপারটাও অনেকটা তাই। আশ্চর্যের কথা হল বহুক্ষেত্রেই বক্তারা মনে রাখেন না–বা মনে রাখলেও তা কি কাজে লাগান? না, তা লাগান না। এ বিষয়ে অবশ্য নির্ভুল কোন নিয়ম সামনে রাখা সম্ভব নয়, তবে কিছু এমন বিষয় আছে যা আলোচনা করে মনে গেঁথে রাখা যেতে পারে।

১. গোড়াতেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করুন

আমি একবার নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. লিন হ্যারল্ড হাউকে প্রশ্ন করেছিলাম, বক্তা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা কি রকম বলে। একটু ভেবে তিনি বলেন : প্রথমেই দরকার আকর্ষণীয় প্রস্তাবনা যাতে শ্রোতাদের চট করে

মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। ডঃ লিন একজন বিখ্যাত বক্তা। তিনি যেভাবে সুরু করতেন সেটা একটু দেখা যাক।

কোন ঘটনার উদাহরণ দিয়ে শুরু করবেন

লাওয়েল টমাস ছিলেন একজন খ্যাতনামা সংবাদ বিশ্লেষক, বক্তা, চলচ্চিত্র প্রোডিউসার। তিনি লরেন্স অব অ্যারাবিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে এইভাবে আরম্ভ করতেন :

একদিন আমি জেরুজালেমের ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রীটে হেঁটে চলার সময় ঝলমলে প্রাচ্যদেশীয় পোশাক পরিহিত একজন মানুষের দেখা পাই.... তার পোশাকের একদিকে ঝুলছিল বিশাল একখানা তরবারী....।

এরপরেই তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করে যান। এভাবে শুরু করলে ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকে না। শ্রোতাদের আগ্রহী করে তোলা যায় সহজেই।

যে বক্তা কোন কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন, যে কাহিনী তার অভিজ্ঞতা লব্ধ তিনি কখনই ব্যর্থ হন না। যে কোন দীর্ঘ বক্তৃতা করার ক্ষেত্রে এই ধরণের কাহিনী দিয়ে শুরু করলে সহজে সপ্রতিভভাবে এগিয়ে চলা সম্ভবপর হয়। তবে মনে রাখবেন অতি নাটকীয়তা কখনই আনতে চাইবেন না। প্রতিটি শব্দ আর কথা বলার সময় পরস্পর সম্বন্ধ রেখে চলা চাই। কোনভাবেই শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাইবেন না।

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা আর সেই তুলনায় দীর্ঘ বক্তৃতা করার সময় কিছু বিভিন্নতা থাকবেই।

শ্রোতাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলুন

যে কোন ছোট ভাষণের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়ে থাকে, কোন দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করার সময়ও সেই একই নীতি কার্যকর। অর্থাৎ শ্রোতাদের মানসিক ব্যাপারটা একই রকম থাকায় তাদের আগ্রহ জাগানোই বক্তার প্রথম কর্তব্য হবে। এই আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সময় এমনভাবে সুরু করা চাই যাতে শ্রোতারা আরও জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

শ্রোতাদের চাহিদা পূর্ণ করার মতো বক্তব্য রাখুন

নিশ্চিতভাবে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার উপায় হল তারা যা চায় সেটি পাওয়ার পথ ও প্রতিশ্রুতি। যেমন এইভাবে শুরু করা চমৎকার :

‘আমি আপনাদের ক্লান্তি দূর করার উপায় সম্পর্কে বলতে চাই।’

‘আমি আপনাদের আয় কি করে বাড়ানো সম্ভব সেই সম্বন্ধে বলব।

‘আমি কথা দিতে পারি, আমি যা বলব সে কথা যদি দশ মিনিট ধৈর্য ধরে শোনেন তাহলে কিভাবে জনপ্রিয় হওয়া যায় নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবেন।’

এই রকম শপথ করার উদ্ধৃতিসহ বক্তব্য শুরু করলে চট করে শ্রোতাদের আগ্রহী করে তোলা যায়। কারণ এখানে শ্রোতাদের ব্যক্তিগত আকাক্ষা যুক্ত থাকে। সকলেই কিছু না কিছু জানার জন্য উদগ্রীব তাই দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে কোন উপায় বা পথ নির্দেশ থাকা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়।

অভিজ্ঞদের নাম উল্লেখ করুন

বক্তৃতা করার সময় প্রায়শঃই কোন বিশেষ অভিজ্ঞ মানুষের উদাহরণ দিতে পারেন। অবশ্য সেই

অভিজ্ঞতার উদাহরণ রাখার সময় নিচের কথাগুলি মনে রাখতে হবে :

১। যে উদ্ধৃতি রাখতে চাই সেটি কি নির্ভুল?

২। এটি কি কোন ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ অর্থনীতির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কখনই জো লুইয়ের উদাহরণ রাখা প্রাসঙ্গিক হবে না।

৩। যার উদাহরণ রাখছি শ্রোতাদের তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আছে তো?

৪। যে অভিজ্ঞতার উদাহরণ রাখবো তা কি শুধু ব্যক্তিগত সুবিধা লব্ধ না অন্যেরও কাজে লাগবে?

আমাদের পাঠক্রমের একজন সদস্য একবার ব্রুকলীনের চেম্বার্স অব কমার্সে বক্তৃতা করার সময় অ্যান্ড্রু কার্নেগীর উদ্ধৃতি দিয়ে ছিলেন। কাজটা কি তিনি ঠিক করেন? হ্যাঁ, ঠিক, কারণ যার কথা তিনি বলেন শ্রোতাদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যবসায় সাফল্যের ব্যাপারে তার চেয়ে যোগ্য কেউ আর নেই। সেই উদ্ধৃতিটি এই রকম :

'আমার বিশ্বাস যে কোন বিষয়ে প্রকৃত সাফল্য লাভের প্রকৃষ্ট পথ একমাত্র সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা। কারও সম্পদ নানা ভাবে ছড়িয়ে ফেলায় আমি বিশ্বাস করি না। আমার জীবনে এমন কাউকেই দেখিনি–বিশেষভাবে উৎপাদনের কাজে–যিনি নানা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে অর্থ উপার্জন করেছেন। যে সব মানুষ সফল হয়েছেন তারা একটা লাইন বেছে নিয়ে তাতেই লেগে থেকেছেন।'

সারাংশ প্রকাশ করুন

দীর্ঘ বক্তৃতার ক্ষেত্রে অনেকটা সময় ধরেই নানা কথা বলা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে উপসংহার টানার সময় কিছু বিশেষ পথ গ্রহণ কর্তব্য। দীর্ঘ বক্তৃতায় বক্তা সাধারণতঃ জানা বিষয় উল্লেখ করার ফলে শ্রোতারা অনেক সময় বিহ্বল হয়ে পড়ে, মূল বক্তব্য তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। খুব কম বক্তাই ব্যাপারটা উপলব্ধি করে থাকেন। তাঁরা ধরে নেন বিষয়টা তাঁদের কাছে যেহেতু বেশ স্বচ্ছ আর সহজ শ্রোতাদের কাছেও বুঝি তাই। তার কিন্তু কখনই হয় না। শেক্সপীয়ার যেমন বলেছিলেন, 'শ্রোতারা অনেক কথাই শোনে কিন্তু মনে রাখে কম।'

একজন বিখ্যাত আইরিশ রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন কিভাবে বক্তৃতা দিতে হয়। কথাটা এই রকম : 'শ্রোতাদের প্রথমে বলুন কি বলতে চলেছেন। তারপর সেটা বলুন, তারপর আবার তাদের বলুন কি বললেন। এই কারণেই তাদের কি বললেন তার সারাংশ আবার বলা চাই। সারাংশের উপকারিতা এই জন্যই অপরিসীম।

এবার ভাল বক্তা হওয়ার জন্য বক্তৃতা দেবার নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য আর নিয়ম ছাড়াও দরকার হয় আরও অনেক কিছু। এ হল বক্তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বিষয় যা শ্রোতাদের সঙ্গে অনেকখানিই জড়িত। সেগুলো হল এই :

মঞ্চে উপস্থিতি ও ব্যক্তিত্ব

এ সম্পর্কে আগে আলোকপাত করা হলেও বিষয়টি এতই জরুরি যে আরও বিশদ করে জানা দরকার।

ব্যক্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে। একে চট করে বদল করা যায় না। যে কোন জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব অনেকখানি কাজ করে। তাহলে কি ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় না? হ্যাঁ, অবশ্যই হয়। এর জন্য অভ্যাস প্রয়োজন। শ্রোতাদের সামনে কথা বলার সময় এজন্য প্রথমেই তাদের মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজন। এই মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে ক্লান্ত ভঙ্গী হয় মারাত্মক। বক্তাকে তাই মঞ্চে ওঠার সময় বা শ্রোতাদের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে তিনি যেন ক্লান্ত না থাকেন। ধরুন কোন ব্যবসা সংক্রান্ত সভায় আপনি বক্তব্য রাখতে চলেছেন–সেক্ষেত্রে কখনই মধ্যাহ্ন ভোজের পর অফিসে কাজে যোগ দেবেন না। এজন্য আপনার যা চাই তা হল বিশ্রাম।

কোন জরুরী বক্তৃতা করার আগে খাদ্য সম্পর্কেও সতর্কতা নেওয়া দরকার। বিখ্যাত গায়িকা মাদাম সেলবা বলেছিলেন, ‘কোন অপেরা বা কনসার্ট থাকলে আমি অত্যন্ত অল্পই খেতে অভ্যস্ত। অনুষ্ঠান শেষ হলে বাড়ি ফিরে পুরো আহার করতে চাই।’

পোশাক কতটা প্রতিক্রিয়া আনে?

একজন মনস্তত্ত্ববিদ বেশ কিছু মানুষকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন পোশাক তাদের মনে কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে নিখুঁত পরিপাটি পোশাক পরলে, তার অনুভূতি সকলের মনেই অদ্ভুত একটা ভাবনার জন্ম দেয়। এই ভাব কোন রকমে প্রকাশ করা যায় না। এই নিখুঁত। পোশাক পরা থাকলে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস দারুণভাবেই বেড়ে যায় তারা টের পেয়েছে। এতে তাদের আত্মসম্মান বোধও ঢের বেড়ে যায়। তারা লক্ষ্য করে দেখেছেন, তারা সাফল্যের কথা ভাবলে সাফল্য লাভ করাও যেন এতে সহজ হয়ে যায়। যিনি ভাল, নিখুঁত পোশাক পরেন তার উপর এর প্রতিক্রিয়া হয় এই রকমই।

কিন্তু শ্রোতাদের উপর পোশাকের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়? বারবার রক্ষ্য করে দেখেছি কোন জনসংযোগের ক্ষেত্রে বক্তার দেহে যদি ঢোলা ট্রাউজার, ইস্ত্রি ছাড়া কোট আর নোঙরা জুতো থাকে, আর। পকেট থেকে পেন বা তামাকের পাইপ উঁকি মারতে থাকে তাহলে শ্রোতাদের মনে সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে নিখুঁত, ভদ্র, আড়ম্বর বর্জিত পোশাক প্রথম আবির্ভাবেই শ্রোতাদের মনে ভাল ধারণা জাগিয়ে তোলে। এতে একটা শ্রদ্ধার ভাবও শ্রোতাদের মনে জেগে উঠতে শুরু করে।

শুধু পোশাকই নয়। সেই সঙ্গে নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো চুল, ফিটফাট মুখভঙ্গী পোশাকের মতই শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কারণেই প্রত্যেক বক্তাকে বাইরের এ বিষয়েও তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া দরকার।

আমেরিকার সেকালের বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল গ্র্যান্ট এই পোশাকের ব্যাপারে একবার তীব্র অনুশোচনা করেছিলেন। গৃহযুদ্ধ শেষে শত্রুপক্ষের সেনাপতি জেনারেল লী যখন অ্যাপোম্যাটক্স কোর্ট হাউসে গ্ল্যান্টের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য আসেন, তার দেহে ছিল নতুন সামরিক পোশাক। তাঁর কোমরের একপাশে ঝুলছিল বহু মূল্যবান একখানা তরবারী। অন্যদিকে গ্ল্যান্টের দেহে কোন কোট ছিল না, তরবারীও ছিল না। তার দেহে ছিল একটা শার্ট আর ট্রাউজার। নিজের আত্মজীবনীতে গ্র্যান্ট লেখেন, তুলনায় আমাকে অতি দরিদ্র আর তুচ্ছ দেখাচ্ছিল আমার পাশেই দাঁড়ান ছিল ছ' ফিট দীর্ঘ এক সুপুরুষ, চমৎকার নিখুঁত তার পোশাক। ওই ঐতিহাসিক দিনটিকে নিখুঁত পোশাক না পরে থাকার জন্য সারাজীবন অনুতাপ করেছিলেন জেনারেল এ্যান্ট।

ব্যাপারটি এই রকমই হয়। বক্তাও সব সময়েই শ্রোতাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টির মধ্যে থাকেন– তাকে আতস কাঁচের নিচে রেখেই যেন যাচাই করা হতে থাকে, তার সামান্যতম ত্রুটিও অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে।

কথা শুরু করার আগেই আমরা গৃহীত বা বাতিল হই

বেশ কয়েক বছর আগে আমি একজন নামী সফল ব্যাঙ্কার সম্পর্কে আমেরিকান ম্যাগাজিনে লিখছিলাম। তার এক বন্ধুকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম ভদ্রলোকের সাফল্যের কারণ কি? সেই বন্ধুটি উত্তরে বলেছিলেন সাফল্যের কারণ হল তার বিজয়ী হাসি। প্রথমে ভেবেছিলাম কথাটায় বাড়াবাড়ি আছে, পরে জেনেছিলাম কথাটা নিছক সত্যি। সত্যিই এই ধরনের বিজয়ী হাসি শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম।

এক চীনা প্রবাদ আছে, ‘যে হাসতে পারে না, তার কোন দোকান করা উচিত নয়। হাসি অনেক ক্ষেত্রেই ছোঁয়াচে হতে পারে। আমাদের ব্যবহারই শ্রোতাদের মধ্যে অনুকুল ধারণা জাগাতে চায়। তাই আমাদের উপস্থিতির মধ্যে যদি গ্রহণযোগ্য ভাব না থাকে তাহলে শ্রোতাদের মধ্যে প্রথম দর্শনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগতে পারে। তাই জেনে রাখা চাই আমরা কথা শুরু করার আগেই গৃহীত বা বর্জিত হয়ে যাই শ্রোতাদের কাছে। এই কারণেই আমাদের ভাবভঙ্গী এমন হতে হবে যাতে সকলের কাছ থেকে উত্তাপ ভরা আগ্রহ পেতে পারি।

শ্রোতাদের এক জায়গায় কাছাকাছি আনবেন

একজন জনসংযোগকারী বক্তা হিসেবে আমি একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করেছি। যখন কোন বড় হলঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রোতাদের সামনে কিছু বলেছি, তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া খুবই কম হয়েছে। অন্যদিকে কোন দর্শক বা শ্রোতায় ঠাসা ছোট্ট ঘরে যখন কিছু বলেছি শ্রোতাদের মধ্যে তার অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করে বুঝেছি যে, যত ভাল বিষয়বস্তুই হোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া মোটেই হয় না। খালি আসন বা চেয়ার আগ্রহে জল ঢেলে দেয়।

হেনরি ওয়ার্ড বিচার করে বলেছেন, সামান্য বারো জন শ্রোতার সামনে কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায় যদি তারা আমার চারপাশে ঘিরে থাকে। আর এক হাজার শ্রোতাও

যদি চার ফিট করে পরস্পরের তফাতে থাকে তাহলে ফাঁকা ঘরে কথা বলছি বলেই মনে হয়।

বিশাল শ্রোতাদের সামনে যে কোন বক্তাই তার বক্তিসত্ত্বা হারিয়ে ফেলেন। তিনি দর্শকদেরই একজন হয়ে যান–এক্ষেত্রে তিনি অনেক সহজভাবে কাজ করতে পারেন কারণ অল্প শ্রোতার সামনে তাঁকে ঢের সতর্ক থাকতে হয়। অতএব সবচেয়ে ভাল হয় শ্রোতার সংখ্যা বেশি হলে।

অল্প শ্রোতাদের সামনে কোন মঞ্চ থেকে না বলাই ভাল। এক্ষেত্রে একই উচ্চতায় তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েই কথা বলা ভাল।

মঞ্চে কোন অতিথি রাখবেন না

আমি একবার অন্টারিওতে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে বক্তৃতা করতে দেখেছিলাম। একটু পরে একজন কর্মচারি ঘরের জানালাগুলো খুলে দিতে আরম্ভ করে। এতে কি হয়? হলের প্রায় সমস্ত শ্রোতাই বক্তাকে আমল না দিয়ে ওই কর্মচারীকে লক্ষ করতে থাকে।

এর কারণ শ্রোতারা কিছুতেই কোন চলমান বস্তু না লক্ষ করে পারে না। প্রত্যেক বক্তাকেই কথাটা মনে রাখতে হবে। এছাড়াও বক্তা নিজেও শ্রোতাদের অমনোযোগী করে তুলতে পারেন। আর সেটা করা হয় অকারণে হাত নাড়তে চেয়ে, জামায় হাত দিয়ে, মাথার চুল স্পর্শ করে ইত্যাদি। এ ধরনের মারাত্মক অভ্যাস বর্জন করা চাই।

বিখ্যাত বক্তা ডেভিড বেলাসকো কোন মঞ্চের টেবিলে লাল গোলাপ রাখতে দিতেন না কারণ তা শ্রোদাঁতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই কারণেই মঞ্চে কোন বাড়তি কাউকে রাখতে দেবেন না। না, কোন অতিথি নয়।

.

১৪. যা শিখলেন তা কাজে লাগানো

আমার পাঠক্রমের চৌদ্দতম অধ্যায় শেষ হওয়ার পর আমি প্রায়ই শুনেছি আমার ছাত্ররা কিভাবে এই বইয়ের কৌশলগুলো প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগিয়েছে। আমার আনন্দ এতে বাধ মানেনি। আমি বলেছি এই পাটক্রম থেকে বিক্রয় প্রতিনিধিরা তাঁদের বিক্রি বাড়াতে পেরেছেন, উচ্চপদস্থ কর্মীরা প্রোমোশান লাভ করেছেন–আর এর সবই তাদের দক্ষতা বেড়ে গিয়েছে বলেই। আর তা এসেছে তাদের সমস্যা সমাধানে পাঠ্যক্রম কাজে লাগিয়ে।

এন. রিচার্ড ডিলার তাঁর 'টুডে'জ স্পীচ-এ লিখেছেন : বক্তব্য, কোন বিশেষ ধরনের বক্তব্য, বক্তব্যের ওজন, আর এই বক্তব্যের আবহাওয়া...শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাণদায়ী রক্ত প্রবাহের ভূমিকা নিতে পারে।' জেনারেল মোটর কোম্পানির ডেল কার্নেগি পাঠক্রমের অধিকর্তা আর, ফেড. কানোডে লিখেছেন : আমাদের জেনারেল মোটর প্রতিষ্ঠানে আমরা যে বক্তৃতার পাঠক্রম অনুরাগী হয়েছি তার কারণ আমাদের প্রত্যেক সুপারভাইজারই এক একজন শিক্ষক। প্রতিটি নতুন কর্মীকেই তারা গোড়া থেকেই শিক্ষা অনুরাগী করে তোলেন।

বক্তব্যের সিঁড়ি বেয়ে আমরা জনসংযোগের ক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হতে থাকি-জনগণের সামনে বক্তৃতা যেসব ক্ষেত্রে একান্ত দরকার–ততই আমরা দেখতে পাই আলোচনা, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা মেটানো, নীতি-নির্ধারণ, ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এই জনসংযোগকারী বক্তৃতা কি অসাধারণ কার্যকরী। এ বইয়ের উপদেশ আর পরামর্শ তাই চমঙ্কার ভাবেই কাজে লাগানো সম্ভব। বিক্রয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এটা অভাবনীয় সাফল্য আনতে সক্ষম তার প্রমাণ বহুবারই পাওয়া গেছে।

আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন আগে তেরোটা পরিচ্ছেদ থেকে যা শিখেছেন সেগুলো কিভাবে কোথা থেকে কবে কাজে লাগাতে শুরু করবেন। আমার উত্তর শুনে হয়তো অবাক হবেন : এখনই।

আপনি এখনই, এই মুহূর্তেই হয়তো কোন জনসংযোগকারী বক্তৃতা দিচ্ছেন না, তা সত্ত্বেও বলতে চাই আপনার দৈনন্দিন জীবনেও আপনি এটা কাজে লাগাতে পারবেন। এখনই কথাটা বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই পরক্ষণেই যে মানুষের সঙ্গে আপনার কথা বলার দরকার হবে তাকে দিয়েই আপনি আরম্ভ করুন।

আপনি যদি পুরো বিষয়টা একবার বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে আশ্চর্য হয়ে দেখবেন যে আপনার দৈনন্দিন কাজে কর্মে, চিরাচরিত কথাবার্তায় কেমন ফল পেতে সুরু করেছেন।

সাত নম্বর পরিচ্ছেদে আপনাদের জানানো হয়েছে কোন দলের সামনে কথা বলার সময় কোন্ চারটি নিয়ম মেনে চলতে হবে : আপনি হয়তো শ্রোতাদের জানাতে চান তাদের

উৎসাহিত করতে চান, তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে চান বা কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চান। জনসংযোগের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি আমাদের মনে রাখা দরকার।

প্রাত্যহিক কথাবার্তায় ও সব বিষয়গুলোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে থাকে আর সারাদিনে নানাভাবে কার্যকর হতে থাকে। কখনও আমরা হয়তো কোন হালকা ধরণের আলাপ আলোচনায় মেতে থাকি আবার পরক্ষণেই কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কোন পণ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এই বইয়ে লেখা নিয়মগুলো কাজে লাগাতে পারলে সব রকম অবস্থাতেই তাকে কাজে লাগানো যাবে। এ থেকে আমরা

যে কোন ভাবেই নানা ধারণা লাভ করে অপরকে কোন কাজে লাগাতেও পারি।

১. প্রাত্যহিক কথাবার্তায় নির্দিষ্ট বর্ণনা রাখুন

মাত্র একটা নিয়ম নিয়ে দেখা যাক এবার। মনে রাখবেন, প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছি আপনার বক্তব্য রাখার সময় তাকে বর্ণনাময় করা চাই। এটা করলে আপনার বক্তব্য বেশ সহজ আর সজীব হয়ে উঠবে। অবশ্য কোন একদল শ্রোতার সামনেই এটা করার কথা বলেছি। তবুও রোজকার কথাবার্তায় এর কি কোন দাম নেই? অবশ্যই তা আছে। প্রাত্যহিক মেলামেশা আর আলাপ আলোচনাতেও এর মূল্য অনেক।

তবে একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার। কথাবার্তায় এই দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা অবশ্যই চাই। অল্প কিছু লোকজনের কাছে কথা বলতে গেলেও আপনার ধারণাকে : স্পষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। নিজের

অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় নিয়েই বক্তব্য রাখা চাই-কথা শুরু করার পর দেখবেন কেমন তরতর করে এগিয়ে চলেছেন।

গৃহকর্ত্রীরা এ ব্যাপার থেকে যথেষ্ট সুফল পেতে পারেন। সিনসিনাটির মিসেস আর. ডি. হার্ট লিখেছিলেন, 'দেখতে পেলাম আমার নতুন অভিজ্ঞমতা কতখানি আনন্দের হয়ে উঠেছে। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় ঘটমান বিষয় আমার যথেষ্ট অবহিত করে তোলে। আমি কথা বলতে পেরে দারুণ খুশি হই।'

কোন শিক্ষিকার কাছে ব্যাপারটা নতুন নয়। আমরা অনেকে কিন্তু শিক্ষকের কাজ না করলেও প্রাত্যহিক জীবন যাপনের সময় অনেক সময়েই কাউকে না কাউকে কিছু শেখানোর জন্য বলে থাকি। বাবা মা তার সন্তানদের শেখানোর জন্য বলেন, পড়শীরা অনেক বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, ভ্রমণবিলাসীরা সহজে সস্তায় কোন্ পথে ভ্রমণ করলে ভাল হয় বলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এসব করা হয়।

২. কর্মক্ষেত্রে জনসংযোগ কৌশল কাজে লাগান

এবার আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কর্মক্ষেত্রে এই জনসংযোগ কৌশল কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটাই দেখব। মনে রাখবেন বিক্রয় প্রতিনিধি, ম্যানেজার, করণিক-গ্রুপ নেতৃত্বের অধিকারী, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক–আমরা এর যে কোন পদেই কাজ করি না কেন, আমাদের দায়িত্ব থাকে নিজেদের বিশেষ এলাকা সম্বন্ধে অপরকে শেখানো। এটা অনেক সময়েই পেশাদারী হতে পারে। এই সব কাজে নিজেদের দক্ষতা প্রকাশ বহু ক্ষেত্রেই আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়ক হয়ে ওঠে।

কিছু জানানোর সময় দ্রুত চিন্তা করা আর সেই জ্ঞান চমৎকারভাবে পরিবেশন করাই দক্ষতার লক্ষণ। এই কারণেই দক্ষতা অর্জন তখনই আরও ভাল হতে পারে যদি আমরা জনসংযোগের সহজ নিয়মকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। ক্রেতার কাছে বিক্রয় প্রতিনিধি, ছাত্রের কাছে শিক্ষক, অধস্তন কর্মীর কাছে ম্যানেজার সকলেই তাদের লব্ধ জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে পারেন।

৩. জনসংযোগের সুযোগ অন্বেষণ করুন

এই বইয়ে জানানো প্রতিদিনের বক্তব্য রাখার বিষয় কাজে লাগানো সুযোগ আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে। আপনাকে অনবরত জনসংযোগের সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। এটা কিভাবে করবেন? যে সব ক্লাবে জনসংযোগকারী বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ আছে সেখানে সদস্য হতে পারেন। তার নিছক সদস্য হলেই হবে না, আপনাকে কার্যকর ভূমিকাও নিতে হবে। সদস্যদের সামনে কথা বলার অভ্যাসটি গড়ে তুলতেও হবে।

যখনই সুযোগ আসবে বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করবেন। সুযোগ পেলে নামী কোন বক্তার বক্তৃতা শোনার চেষ্টাও করতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে নিজেকেই কথা বলার, জনসংযোগের সুযোগটি খুঁজে নিতে হবে।

৪. লেগে থাকা চাই

আমরা যখনই কোন নতুন কিছু শিখিযেমন ধরা যাক ফরাসী ভাষা শেখা বা গলফ খেলা বা ধরুন জনগণের সামনে বক্তৃতা করা, সব বিষয়েই আমরা সমান তালে এগুতে পারি না। তাই ধীরে ধীরে আমাদের উন্নতি লাভও সম্ভব হয় না। ঢেউ যেভাবে আসে আমরা

সেইভাবেই থেমে থেমে একটু একটু করে শিখি। তারপর বেশ কিছুদিন এক জায়গায় আটকে থাকি–আগেকার শেখা অনেকটা ভুলেও যাই। মনস্তাত্ত্বিকরা এই অবস্থাকে বলেন শিক্ষার বক্তৃতায় অধিত্যকা। জনসংযোগের ছাত্ররা প্রায়ই হয়তো এই রকম অধিত্যকায় আটকে যায়। শত কঠিন পরিশ্রমেও যেন তারা লড়তে পারেন। দুর্বল যারা তারা এ অবস্থায় হতাশায় হাল ছেড়েও দেয়। যারা কঠিন প্রত্যয় নিয়ে লেগে থাকতে সক্ষম তারা একদিন অবাক হয়ে দেখে আচমকা তারা যেন বাধার প্রাচীর পার হয়ে চমৎকার উন্নতি করেছে। অধিত্যকা পার হয়ে তারা যেন প্লেনে উঠতে সুরু করেছে। ব্যাপারটা যেন রাতারাতি ঘটে যায়। তাদের মধ্যে জেগে ওঠে স্বাভাবিকতা, আত্মবিশ্বাস আর শক্তি।

এ বইয়ে আগে যেমন বলা হয়েছে, জনসংযোগ শুরু করে কথা বলতে গিয়ে আপনি হয়তো গোড়ায় নিদারুণ ভয়, ধাক্কা বা স্নায়বিক দুর্বলতা বোধ করতে পারেন। শ্রোতাদের মখোমুখি হলেই এই ভাব দেখা দেওয়া সম্ভব। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরাও শ্রোতাদের সামনে এমন বোধ করেন। পেড্রেভস্কি পিয়ানোর সামনে বসলেই নার্ভাস হয়ে পড়তেন। কিন্তু পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করার পর ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠতেন। পেড্রেভস্কির অভিজ্ঞতা আপনারও হতে পারে। শুধু যদি একাগ্রতা বজায় রাখতে পারেন, তাহলেই প্রথম দিকের ভীতি কাটানো সে রকম অসম্ভব হবে না। প্রাথমিক ভয় কাটাতে পারা মানেই অর্ধেকটা জয় করা। কথা বলার মুখে হয়তো কিছুটা ভয় লাগা স্বাভাবিক–কথা বলতে শুরু করুন দেখবেন একটু একটু করে সে ভয় কেটে গেছে। আনন্দের সঙ্গেই এরপর কথা বলে যেতে পারবেন।

একসময় এক তরুণ, আইন পাঠ করার জন্য ইচ্ছুক হয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে উপদেশ চেয়ে চিঠি লিখেছিল। লিঙ্কন তাকে জবাবে লেখেন : ‘তুমি যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে

আইনবিদ হওয়ার মনস্থ করে থাকো তাহলে অর্ধেক কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে...সব সময় মনে রাখবে সাফল্য লাভ করার জন্য তোমার একান্ত বাসনাই অন্য সব কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্কন একথা জানতেন। সারা জীবনে সেটাই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা। অথচ সারা জীবনে একবছরের বেশি তিনি স্কুলে শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। আর বই? লিঙ্কন একবার বলেছিলেন তাঁর বাড়ির পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যেখানে যত বই ছিল সবই তিনি ধার করে পড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর কেবিনে সারা রাত ধরে কাঠের আগুন জ্বলত। মাঝে মাঝে হাতের কাছে রাখা ছড়িতে আগুন উসকে দিতেন তিনি এবং সেই জ্বলন্ত কাঠের আগুনের আলোয় পড়ে যেতেন লিঙ্কন। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় পাশ ফিরে চোখে জল নিয়ে লিঙ্কন পাশে রাখা কোন বই নিয়ে আবার পড়ে চলতেন।

তিনি কখনও কখনও ত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে কোন বক্তার বক্তৃতা শুনতে যেতেন। সব রকম পথে হাঁটার অভ্যাস করতেন লিঙ্কন–অনেকক্ষেত্রে বনজঙ্গলে। যে কোন জায়গায় তিনি বক্তৃতা শোনার জন্য ছুটে যেতেন। তিনি বক্তৃতার নেশায় যোগ দিয়েছিলেন নিউ সালেমের বিতর্ক ক্লাবে–আর দিনরাত বক্তৃতা দান অনুশীলনী করে চলতেন। সে বক্তৃতা হত সাধারণত সমসাময়িক সমস্যা। মেয়েদের সামনে একটু লজ্জা পেতেন লিঙ্কন। মেরি টডের সঙ্গে প্রেমে পড়লে লিঙ্কন লজ্জায় বেশি কথা বলতে পারতেন না, পার্লারে বসে মেরীর কথাই শুনে যেতেন। অথচ আশ্চর্য কথা সেই মানুষই অনুশীলন আর প্রাণপাত চেষ্টায় হয়ে ওঠেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বক্তা আর সেকালের শ্রেষ্ঠ বক্তা সেনেটর ডগলাসের সমকক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। এই মানুষটিই গেটিসবার্গে যে ভাষণদান করেন মানুষের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে চিরকাল।

তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই, নিজের প্রচণ্ড অসুবিধা আর জীবন সংগ্রাম সত্ত্বেও লিঙ্কন লিখেছেন অদম্য বাসনা থাকলে সে কাজের অর্ধেকই হয়ে যায়...।'

ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, হোয়াইট হলের মধ্যে লিঙ্কনের বিশাল এক তৈলচিত্র টাঙানো আছে। প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট লিখেছেন : 'যখন কোন ব্যাপারে সমস্যায় পড়ি, বা মেটানো বেশ কঠিন মনে হয়–আমি লিঙ্কনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করি আমার জায়গায় থাকলে লিঙ্কন কি করতেন। আপনারা হয়তো ব্যাপারটা আশ্চর্য মনে করবেন। তবুও আমি দেখেছি আমার সমস্যা এতে অনেক হালকা হয়ে যায়।'

তাহলে আপনিও রুজভেল্টের মতো করুন না কেন? যখন কোন বক্তৃতা দেওয়ার সময় সমস্যায় আকীর্ণ হবেন লিঙ্কনের কথাই ভাবুন না কেন? তিনি ওই সময় কি করতেন? আপনি অবশ্যই জানেন তিনি কি করতেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের নির্বাচনে তিনি স্টিফেন এ ডগলাসের কাছে পরাজিত হওয়ার পর বলেন : 'একবার কেন একশবার পরাজিত হলেও হাল ছাড়া উচিত নয়।

৫. পুরস্কারের অবশ্যম্ভাবিতা সামনে রাখুন

আমার একান্ত বাসনা আপনারা আপনাদের প্রাতরাশের টেবিলে প্রফেসর উইলিয়াম জেমসের এই লেখাটি রেখে মুখস্থ করে ফেলবেন :

'কোন তরুণ তার লাইন যে রকমই হোক, সে যেন তার শিক্ষা নিয়ে কোনরকম উদ্বেগ বোধ না করে। দৈনিক জীবনে সে যদি নিয়মিত প্রতিটি ঘন্টা বিশ্বস্তভাবে কাটায় তাহলে সফলতা আসবেই। একদিন সে দেখতে পাবে সফলতা তার হাতের মুঠোয়।'

প্রফেসর জেমসের মত আমিও বলতে চাই বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অনুশীলন করে চললে একদিন আপনার পক্ষেও সুযোগ্য বক্তা হয়ে ওঠা মোটেই কঠিন হবে না।

মনে রাখবেন কথাগুলো যতই অসম্ভব বলে মনে হোক সাধারণভাবে এটা সত্য। অবশ্যই একথা ঠিক এর ব্যতিক্রম আছে। নিকৃষ্ট মানসিক অবস্থার বা ব্যক্তিত্বহীন কোন মানুষের যার বলার মত কিছুই থাকে না, তার পক্ষে কোনো ড্যানিয়েল ওয়েবার হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। তবে কিছুটা তার পক্ষেও নিজেকে তৈরি করা সম্ভব।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : নিউ জার্সির প্রাক্তন গভর্নর স্টোকম ট্রেনটনে একদিন আমার পাঠক্রমের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি সদস্যদের যে বক্তৃতা করতে শুনেছেন তা ওয়াশিংটনের শোনা বক্তৃতার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। এই বক্তৃতা দেন কিছু ব্যবসায়ী আর বিক্রয় প্রতিনিধিরা যারা পাঠক্রমের ক্লাসে যোগদান করার আগে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়াতেই ভয় পেতেন। অথচ তারাই একদিন সকালে জেগে উঠে যেন নিজেদের সফলতায় মণ্ডিত দেখতে পান।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমি বহু বক্তাকে লক্ষ্য করেছি। আমি দেখেছি তাঁদের অনেকেই শ্রোতাদের সামনে কথা বলার ক্ষমতা অর্জনের জন্য কি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান কয়েকজনই মাত্র অল্প আয়াসে দক্ষতালাভ করেছে–বাকি

সকলে কখনও হতাশায় ভেঙে পড়েনি। তাঁরাও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে শিখরে উঠতে পেরেছেন।

এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। ব্যবসা জগতে অহরহ এমনই ঘটে থাকে। জন ডি রকফেলার (বড়) বলেছিলেন ব্যবসাজগতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ধৈর্য আর জ্ঞান। সাফল্য এতে আসবেই। বক্তৃতা আর জনসংযোগের ক্ষেত্রেও তাই।

কয়েক বছর আগে বিখ্যাত বেডেকার অস্ট্রিয়ার দিক থেকে আল্পস পর্বতের শিখরের উচ্চতা মাপার চেষ্টা করেন। এর নাম ওয়াইল্ডার কাইজার। বেডেকার বলেন ওদিক দিয়ে ওঠা বেশ কঠিন ছিল। বিশেষ করে অপেশাদারদের একজন গাইড থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। বেডেকার আর জনৈক বন্ধু গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কোন গাইড ছিল না। একজন তাই জানতে চান তারা সফল হবেন কিনা। অবশ্যই হব',

বেডেকার জবাব দেন।

'এরকম ভাববার কারণ?' ভদ্রলোক জানতে চান।

'অনেকেই গাইড ছাড়া পেরেছেন, বেডেকার বলেন, অতএব আমাদের যুক্তি আমরা কেন পারব। পরাজয়ের কথা ভেবে আমি কোন কাজ হাতে নিই না।'

যে কোন কাজে, এমন কি মাউন্ট এভারেষ্ট বিজয় সম্পর্কেও মনস্তত্ব তাই বলে।

বক্তৃতাদানে বা জনসংযোগের কাজেও কথাটা একই রকম। আপনি কতখানি সফল হবেন তার চিন্তাধারাই আপনাকে অনেকটা প্রভাবিত করে : আপনি যদি মনে মনে ভাবেন সফল হবেন আর সেইভাবেই মনে সাহসের জোগান দেন তাহলে নিশ্চয়ই সফল হতে পারবেন। প্রয়োজন হল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় অ্যাডমিরাল ডুপো অন্ততঃ ছ'টি কারণ দেখিয়ে বলেছিলেন চার্লস্টন বন্দরে কেন তিনি তাঁর বন্দুকবাহী জাহাজ নিয়ে যান নি। অ্যাডমিরাল ফ্যরাগট বেশ মন দিয়ে সব কথা শোনার পর বলেন, আর একটা কারণের কথা আপনি বলেন নি।

'সেটা কি?' অ্যাডমিরাল ডুঁপো প্রশ্ন করেন।

এবার জবাব এলো : 'কাজটা আপনি করতে পারবেন বলে আদৌ ভাবেন নি।'

রাফল ওয়ালডো এমার্সন একবার বলেছিলেন : উৎসাহ ছাড়া কোন বড় কিছু করা কখনই সম্ভব হয় নি। সাফল্যের চাবিকাঠিও তাই।

উইলিয়াম লিয়ন ফেলপস ছিলেন সম্ভবতঃ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ আর জনপ্রিয়তম একজন শিক্ষক। তাঁর 'একসাইটমেন্ট অব টিচিং' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'আমার কাছে শিক্ষাদানের কাজ এক শিল্পকলার মত। এ আমার ভালবাসা। আমি শিক্ষা দিতে ভালবাসি, যেমন শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করতে ভালবাসেন। গায়ক সঙ্গীত ভালবাসেন, কবি তেমন কবিতা রচনা করতে ভালবাসেন। সকালে শয্যা ছেড়ে ওঠার পরেই আমি আমার ছাত্রদের কথাই আনন্দে স্মরণ করি।'

কোন শিক্ষক যে তার কাজে এমন আন্তরিক আনন্দ পান তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? বিলি ফেলপস তাঁর ছাত্রদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব রেখেছিলেন, আর তা তিনি পেরেছিলেন ভালবাসা, আগ্রহ এবং আন্তরিকতার স্পর্শে।

আপনার শেখার বিষয়েও আপনি যদি এ ধরনের আন্তরিকতা দিয়ে অগ্রসর হতে পারেন সমস্ত বাধাই তাহলে দূর করতে পারবেন সন্দেহ নেই। আপনার ক্ষমতা আগ্রহের সামনে এ একটা চ্যালেঞ্জ, তার বিশ্বাস রাখতে শুরু করুন নিজের উপর। চেষ্টা করুন ছোট ছোট কোন দলের আস্থা অর্জন করতে। দেখবেন একটু একটু করে বড় মাপের কিছু কারও আর কঠিন বলে থাকবে না। জনসংযোগে এ ধরনের প্রচেষ্টা ফলবতী হবেই।

ডেল কার্নেগি পাঠক্রমের শিক্ষকদের গাইড বইয়ে এই কথাগুলি লেখা থাকে : ক্লাসের সদস্যরা যখন আবিষ্কার করেন তারা শ্রোতাদের মনোযোগ আর শিক্ষকদের দৃষ্টি অকার্ষণে সমান–তখনই তারা অন্তরে একটা ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁদের সাহস আর আত্মবিশ্বাসে কোন ত্রুটি থাকে না। এর ফলাফল কি হয়? তাঁরা স্বপ্নেও যা ভাবতে পারেন নি সেই কাজই তারা করতে সক্ষম হন। তাঁরা শ্রোতাদের সামনে কথা বলার সুযোগই খুঁজতে থাকেন। তারা ক্রমেই অনেক বেশি করে ব্যবসা সংক্রান্ত আর পেশাদারী, সামাজিক কাজকর্মে যোগদান করে নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

'নেতৃত্ব' কথাটি এই বইয়ে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। সমাজে নেতৃত্বের চিহ্ন হল দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গি, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। এ ধরনের গুণাগুণ যার

মধ্যে প্রকাশ পায় সমাজে, তিনিই সকল নেতৃত্বের অধিকারী হন। আপনিও সে ক্ষমতা অর্জনে সচেষ্ট হবেন না কেন?